গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ১৭ - ২৩ জুন, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

রাতের অন্ধকারে নির্মম লাঠিচার্জ

গত ১০ জুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের অনশন ভাঙতে রাতের অন্ধকারে মহাকরণের নির্দেশে পুলিশ গত সাতদিন ধরে অনশনে থাকা দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে লাঠি চালিয়ে আহত করে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ঢুকেও পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের ওপর তাণ্ডব চালায়। সংবাদে প্রকাশ, মহিলা পুলিশ না নিয়ে মদ্যপ পুরুষ পুলিশ দিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রীদের উপর বর্বর আক্রমণ চালাতে পর্যন্ত তারা দ্বিধা করেনি। এমনকি চিকিৎসার নামে জবরদস্তি বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সেখানে পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় ছাত্রছাত্রীদের পেটায় এবং পুলিশ ছাত্রীদের ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করে, শালীনতা হরণের চেষ্টা করে। এই ঘটনাবলী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি এই সরকারের বর্বর দৃষ্টিভঙ্গিকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে

তিনের পাতায় দেখুন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

পুলিশি বর্বরতার নিন্দা

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ জুন তারিখে এক বিবৃতিতে বলেন —

"যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর পুলিশের নৃশংস হামলায় যখন সমগ্র রাজ্যবাসী বিচলিত ও প্রতিবাদে মুখর, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সি পি এম নেতৃত্ব ও তাদের ছাত্র সংগঠন যেভাবে এই হামলার সপক্ষে সাফাই গেয়েছেন, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয়।

অনশনকারী অসুস্থ, দুর্বল ছাত্রদের উপর লোকচক্ষুর অন্তরালে মধ্যরাতের অন্ধকারে এই বর্বর হামলা, হাসপাতালে ছাত্রদের উপর অশালীন আচরণ ও নির্যাতন যে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ সংগঠিত করতে পারে, তারা কত অমানবিক, অগণতান্ত্রিক ও নিষ্ঠুর শক্তিতে পরিণত হয়েছে, এটা পুনরায় উদ্‌ঘাটিত হল। এ রাজ্যের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনেই সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার এই ফ্যাসিস্ট ভূমিকা গ্রহণ করছে। এই রাজ্যে কংগ্রেস শাসনের যুগে বিদ্যালয়ে পুলিশ ঢোকার বিরুদ্ধে সি পি এম সহ সকল বামপন্থী দলই সোচ্চার ছিল, কিন্তু আজ সি পি এম-এর আমলে এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা দাবি করছি— (১) পুলিশি হামলার নিরপেক্ষ তদন্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ-প্রশাসনের যারা এর জন্য দায়ী তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে, (২) আন্দোলনকারী ছাত্রদের সকল ন্যায়সঙ্গত দাবি মানতে হবে, (৩) বিদ্যালয়ে আন্দোলন দমনে পুলিশি হামলা বন্ধ করতে হবে।

পরিশেষে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সমস্ত রকম হুমকি, হামলা ও নির্যাতনকে অগ্রাহ্য করে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

সিপিএম মুখে যাই বলুক

বিদেশি পুঁজির শর্ত মেনেই বিলগ্নীকরণ হচ্ছে

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার রাজ্যজুড়ে 'সংস্কারের' কাজে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রশংসা আসছে চারিদিক থেকে। বিশ্বব্যাঙ্ক প্রশংসা করছে, ডি এফ আই ডি প্রশংসা করছে, প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করছেন, অন্যরাজ্যের প্রতিনিধিরাও পশ্চিমবাংলার 'সাফল্য' দেখে চমৎকৃত হচ্ছেন। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলি রাজ্য সরকারের সংস্কারের কাজ দেখে উচ্ছ্বসিত। এদেরই সম্মিলিত এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটছে পুঁজিবাদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক বৃহৎ সংবাদপত্রগুলিতে। কাগজের প্রথম পাতায় ছবি, গ্রাফিক্স সহ এই 'সাফল্যের' পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ছাপা হচ্ছে। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবি।

আর বিরোধিতা! এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের প্রচারমাধ্যমগুলির ব্যাপক সমর্থনে বলীয়ান সিপিএম নেতৃত্ব আজ আর সাধারণ মানুষের মতামত তথা বিরোধিতার তোয়াক্কা করে না। সংবাদমাধ্যমগুলিতে প্রতিদিন প্রকাশিত সংস্কারের সাফল্যের সোরগোলের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে রাজ্যের অনাহারী শ্রমিক, আত্মঘাতী কৃষক, আর সবহারা মানুষের কান্না। দলের বামপন্থী, সৎ অংশটির মধ্যে যতটুকু বিরোধিতা ছিল এবং যা সংস্কার কাজের অগ্রগতির পথে কাঁটার মত বিঁধছিল, সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এই নীতির চূড়ান্ত অনুমোদনের মধ্য দিয়ে তাকেও উপড়ে ফেলা হল।

এই সংস্কারের অর্থ কী? বাস্তবে এই সংস্কারের অর্থ— মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেকারি, বিনা চিকিৎসা এবং অশিক্ষা। কেন্দ্রেও যা, রাজ্যেও তাই। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের যে 'সংস্কার' কর্মসূচি নিয়ে এত হৈ চৈ, তারও মূল কথা হচ্ছে, রুগ্ন নাম দিয়ে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বন্ধ, স্বেচ্ছাবসরের নামে শ্রমিক ছাঁটাই, সরকারি সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ, পরিষেবামূলক ক্ষেত্রগুলিতে ভরতুকি বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি। সরকার এই কর্মকাণ্ডের নাম দিয়েছে 'সংস্কার' বা 'পুনর্গঠন'। এই পুনর্গঠনকাণ্ডের মূল আঘাত যাঁদের উপর এসে পড়ছে, সেই হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীদের মতামতের এক্ষেত্রে কোন মূল্যই নেই। এঙ্গেল ইন্ডিয়ার শ্রমিকরা বাধা দিয়েছিলেন সংস্থার বেসরকারীকরণে, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কর্মীরা এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সরকার তথা সিপিএম নেতারা— ভয় দেখিয়ে হোক, অথবা লোভ দেখিয়ে, চাপ সৃষ্টি করে বা শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেই হোক, 'পুনর্গঠনের' নামে এই সরকারি শিল্প সংস্থা বেচে দেওয়ার কাজ চালিয়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

নির্বাচন কমিশনের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী ১০ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, পোলিং বুথে সাংবাদিকদের ফটো তোলার উপর সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আমরা তা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক মনে করি।

আমরা মনে করি, বর্তমানে ক্ষমতাশালী নানা দল, বিশেষত শাসকদল ব্যাপক বুথ দখল ও ছাপ্পা ভোটের দ্বারা নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করছে। কমিশনের এই নিষেধাজ্ঞা জনচক্ষু থেকে তা আড়াল করার এবং আরও বেপরোয়া রিগিং করার পথ খুলে দেবে।

আমরা আরও মনে করি, নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত পক্ষপাতমূলক এবং সংবাদপত্র তথা জনগণের সত্য জানবার ও জানাবার অধিকার এবং সংবিধান প্রদত্ত মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ।

আমরা অবিলম্বে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি এবং সংবাদপত্র জগৎ সহ সমস্ত জনগণকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

পেট্রল-ডিজেলের দাম আবার বাড়ছে

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই পেট্রল-ডিজেলের দাম পুনরায় বাড়াবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। লিটার প্রতি ডিজেলে ২.২৫ টাকা ও পেট্রলে ৩.৫০ টাকা বাড়াবার প্রস্তাবকে তারা যতদূর সম্ভব কম করে বাড়ানো বলে চিহ্নিত করেছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখাতে কেন্দ্রীয় সরকার বহুবার ব্যবহার করা সেই পুরানো রেকর্ডই বাজিয়ে বলেছে — আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম বেড়েছে, অথচ আভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের দাম বাড়ানো হয়নি। সেইজন্য দেশীয় জ্বালানি তেল-কোম্পানিগুলিকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, ক্ষতি বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে জ্বালানি-তেলের দাম বাড়াতেই হবে। সরকার একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক সংবাদপত্রগুলির অনেকে বলতে শুরু করেছে — অর্থনৈতিক দিককে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তই নিতে হয়। কিন্তু সরকার রাজনৈতিক দিককে গুরুত্ব দিয়ে, অর্থাৎ জনসাধারণকে খুশি রাখার জন্য দাম বাড়াচ্ছে না এবং তার ফলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকার এবং বাণিজ্যিক সংবাদপত্রগুলি তেলের দাম বাড়ানোর পক্ষে যে যুক্তি দিচ্ছে, বিচার করে দেখা দরকার, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম যতটা বেড়েছে তাতে ভারতে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোটা অনিবার্য কিনা, বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে।

তেলের মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য নয়

এইদিক থেকে যদি আমরা বিচার করি, তাহলে দেখব, বর্তমানে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম খানিকটা বাড়লেও সেজন্য পেট্রল-

চারের পাতায় দেখুন

বিদেশি পুঁজির শর্ত মেনেই বিলগ্নীকরণ হচ্ছে

একের পাতার পর

যেতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু শ্রমিক, কর্মচারী, সাধারণ মানুষের এত বিরোধিতা সত্ত্বেও বেসরকারীকরণের প্রশ্নে সিপিএম নেতাদের কেন এত আগ্রহ, কেনই বা এত তৎপরতা!

সকলেই জানেন, পুনর্গঠনের এই সমস্ত প্রকল্পে খরচের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নীকারী সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্ক, ডি এফ আই ডি (ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশানাল ডেভেলপমেন্ট), এ ডি বি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক) এবং জে বি আই সি (জাপানি ব্যাঙ্ক)। সিপিএম নেতারা বলছেন, রাজ্য সরকারের আর্থিক সংকট দূর করতে এই সংস্থাগুলি নাকি 'সহজ শর্তে' ঋণ দিতে এগিয়ে এসেছে। রাজ্যের ৫৬টি সরকারি সংস্থার বিলগ্নীকরণের এই সমগ্র প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ২৬টি সংস্থার জন্য ডি এফ আই ডি দিয়েছে ২১৪ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ডি এফ আই ডি, বিশ্বব্যাঙ্ক সহ উক্ত সংস্থাগুলি দেবে ১৭০০ কোটি টাকা।

সিপিএম মুখে যতই 'সহজ শর্তের' কথা বলুক না কেন, বাস্তবে এই বিদেশি ঋণের শর্ত মোটেই সহজ নয়। কারণ এই সংস্থাগুলির কোনটিই 'সেবাশ্রম' নয়। এই সমস্ত ঋণের ক্ষেত্রে 'অনুদান' বা 'সাহায্য' (aid) কথাটি খুব চালু আছে। নাম যা-ই হোক, আসলে এসবই হচ্ছে ঋণ (debt), সুদ সহ ঋণ। আগেও যা ছিল, এখনও তাই— অনুদান ও ঋণ সমার্থক। এই ঋণ নিয়ে রাজ্যে সিপিএম, কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতারা জনগণকে বোঝান, দেশের জন্য 'অনুদান পেয়েছি', আর আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপানের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রতিনিধি ঐসব দেশের মন্ত্রী ও লগ্নীকারী সংস্থার কর্তারা গর্ব করে বলেন, 'অনুদান দিয়েছি'। উভয়পক্ষই ভদ্র কথার আবরণ দিয়ে সুদের নির্মম শোষণটাকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আড়াল করতে চায়, গোপন করতে চায় ঋণের কঠিন শর্তগুলি। অপরদিকে ঋণচুক্তির বৈঠকে উন্নয়ন আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ফিরিস্তি, খানাপিনা, খবরের কাগজের প্রথম পাতায়, টেলিভিশনের চ্যানেলে চ্যানেলে নেতা-মন্ত্রীদের হাসিখুশি মুখ দেখে দেশের সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে বসেন, তবে সুদিন এল বুঝি!

বিশ্বব্যাঙ্ক, ডি এফ আই ডি থেকে শুরু করে সমস্ত অর্থলগ্নীকারী সংস্থাই কোন দেশকে ঋণ দেওয়ার সময়ে প্রথম যে অভিযোগটি তোলে তা হল, দেশের অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামোর ত্রুটির জন্যই সংশ্লিষ্ট দেশ বা রাজ্যটি উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। এই ত্রুটি সারানোর দাওয়াইও তারাই বাতলে দেয়। এই দাওয়াইয়ের নাম কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস (structural adjustment) বা পুনর্গঠন (restructuring)। এই পুনর্গঠনে কী কী করতে বলা হয়? ১) সরকারি সংস্থায় ও বাজেটে উদারনীতি চালু কর, ২) উচ্চবিত্তদের উপর থেকে কর কমাও, ৩) মূলত কর্মী ছাঁটাই করে প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচ কর, ৪) পরিষেবা ও সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি ভরতুকি বন্ধ কর, ৫) বিদ্যুতের দাম বাড়াও, ৬) বিদেশি পুঁজি ডেকে আনো, ৭) কৃষিপণ্যের নিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থার পরিবর্তন কর, রপ্তানিযোগ্য অর্থকরী ফসল চাষ কর, কৃষিতে বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দাও, ৮) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পে সাহায্য দাও, ৯) বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ ইত্যাদি। ঋণচুক্তি যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে হয় তবে এর সাথে যুক্ত হয়— আমদানি শুল্ক তুলে নাও, কোটা প্রথা তুলে নাও, রপ্তানিতে উৎসাহ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ কর, মুদ্রার বিনিময় মূল্য কমাও ইত্যাদি। এ কথা আজ আর অজানা নেই যে, পশ্চিমবাংলায় সিপিএম ফ্রন্ট সরকার রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপরোক্ত সমস্ত শর্ত ইতিমধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। অবাধ ছাঁটাইয়ের অধিকার, শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে দেওয়ার ও কাজের সময় বাড়িয়ে দেওয়ার অধিকার, ইচ্ছামত কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার ইত্যাদি সবই মালিকশ্রেণী এ রাজ্যে পেয়ে গিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ সহ রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষেত্রে অবাধ বেসরকারীকরণ চলছে, মূল্যবৃদ্ধিও ঘটানো চলছে অবাধে। জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন খাতে সরকারি বরাদ্দ প্রায় তুলে দেওয়া হচ্ছে। এগুলিই তো 'সংস্কার' নীতির মূলকথা। বিশ্বব্যাঙ্ক সহ ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির অথবা বহুজাতিক সংস্থাগুলির শর্তও এটাই এবং সে শর্ত সিপিএম আগেই মেনে নিয়েছে। ফলে 'শর্ত দেওয়া চলবে না' বলে মুখ্যমন্ত্রী যতই বাজার গরম করুন, আসলে তা একটি চালাকি মাত্র— যার উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণ এবং নিজেদের দলের সৎ কর্মীদের বিভ্রান্ত করা।

দেশি বিদেশি মালিকশ্রেণীর কাছে স্বীকার করতে আপত্তি না থাকলেও ভোটের পার্টি হিসাবে প্রকাশ্যে একথা স্বীকার করা সিপিএম নেতাদের পক্ষে অসম্ভব যে, সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আর্থিক নীতি আসলে হুবহু বিজেপি ও কংগ্রেস অনুসৃত বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের নীতিই। পেটেন্টের প্রশ্নেই হোক বা বিলগ্নীকরণের প্রশ্নেই হোক, সিপিএমের বিরুদ্ধতা এখন পুরোপুরি পার্লামেন্টারি বিরোধিতা। অর্থাৎ দেশের মানুষের কাছে বিরোধী দল হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করাই যার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে যে নীতিকে তারা নিষ্ঠার সাথে কার্যকর করছে, কেন্দ্রে সেই নীতিরই, অন্তত মুখে হলেও, তারা ঘোরতর বিরোধী। কেন্দ্রে যে বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণ নীতির বিরুদ্ধে তাদের শ্রমিক সংগঠন, কর্মচারী সংগঠন প্রবল সোচ্চার, রাজ্য সরকারের সেই নীতি সম্পর্কেই তারা একেবারে অন্ধ। এর থেকে নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ আর কী হতে পারে! আর, এই চালাকিটি আড়াল করার জন্যই সিপিএম ঘোষণা করেছে পশ্চিমবাংলায় এ হলো তাদের 'শিল্প পুনর্গঠনে বিকল্পনীতি', যাকে তারা বলছে 'ভিন্ন দৃষ্টিতে পুনর্গঠন'। এখন দেখা যাক সিপিএমের পুনর্গঠন কর্মসূচি কংগ্রেস, বিজেপির থেকে সত্যিই আলাদা কিনা।

'বিকল্প' শব্দটির প্রতি বরাবরই সিপিএম নেতাদের বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। এ রাজ্যের মানুষ জানেন দীর্ঘদিন ধরে এই সরকার বিকল্প অর্থনীতির কথা বলে আসছে। ক্ষমতায় বসে জনবিরোধী যা কিছু তারা করেছে তার সবই এসেছে 'বিকল্প' রূপ ধারণ করে। এই বিকল্প নীতিতেই ঘাটতি শূন্য বাজেটে ক্রমাগত ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। যে অসীমবাবু দেশের মানুষকে বিকল্প নীতির গল্প শুনিয়েছিলেন, সেই অসীমবাবুর নেতৃত্বেই তাঁদের 'চরম শত্রু' বিজেপি প্রস্তাবিত জনস্বার্থবিরোধী ভ্যাট ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

'উন্নততর বামফ্রন্ট' পুনর্গঠনের যে বিকল্প নীতি তুলে ধরেছে, তাতে রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন ৫৬টি সংস্থাতেই তাঁরা 'সংস্কার' কাজ চালাচ্ছেন। প্রথম পর্বের ২৬টি সংস্থার সংস্কার কাজে ৯টি সংস্থা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। ১১টি সংস্থা তুলে দিয়েছে বেসরকারি মালিকদের হাতে। এতে কর্মচ্যুত হয়েছেন তিন হাজার কর্মী। এক হাজারের বেশি সংখ্যক কর্মীকে আগাম অবসরে বাধ্য করা হয়েছে। আগাম অবসরের বিরুদ্ধে সরকারি হুমকি ও সিটু নেতৃত্বের চাপকে উপেক্ষা করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কর্মীরা। সব মিলিয়ে সংস্কারের প্রথম পর্বে কর্মচ্যুত হয়েছেন ৪ হাজারের বেশি কর্মী। এই পর্বে প্রয়োজনীয় ২১৪ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে যোগান দিয়েছে ডি এফ আই ডি। 'সংস্কারের' দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ২৯টি সংস্থা। এইগুলিতে কাজ করেন ৮০,০০০ কর্মী। এর মধ্যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে কাজ করেন প্রায় ৩০,০০০ কর্মী, পরিবহন ক্ষেত্রে করেন ২৫,০০০ কর্মী। এই পর্বে প্রায় ৪০,০০০ কর্মীকে কাজ হারাতে হবে। এর মধ্যে তন্তুশ্রী, চর্মজ সহ সাতটি সংস্থা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার কথা সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে। এই সংস্থাগুলিতে কর্মরত ছিলেন প্রায় ১৭০০ কর্মী। এই সমগ্র পর্বের জন্য প্রয়োজনীয় ১৭০০ কোটি টাকাও ঋণ হিসাবে যোগাবে ডি এফ আই ডি, বিশ্বব্যাঙ্ক সহ উল্লিখিত সংস্থাগুলি। এই নাকি পুনর্গঠনে সিপিএমের বিকল্প নীতি, আর এই নাকি শর্তহীন অনুদান, আর শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষা!

কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের বিলগ্নীকরণ নীতির পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ওদেরগুলি লাভজনক সংস্থা, আর আমাদেরগুলি রুগ্ন'। সকলেই জানেন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি লাভজনক সংস্থা, পরিবহনও বর্তমানে একটি অত্যন্ত লাভজনক শিল্প— একটু সততা, একটু সদিচ্ছা থাকলে এই সংস্থায় রাজ্য সরকারের লোকসান হওয়ার কোন কারণ নেই। পর্যটন শিল্পও গোটা বিশ্বের সাথে এদেশেও একটি লাভজনক শিল্প হয়ে উঠেছে। অথচ এটিকেও সরকার বেসরকারি মালিকদের মুনাফার জন্য ছেড়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যে অসংখ্য সংস্থা রাজ্য সরকার বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে সেগুলিতে যদি লোকসানের আশঙ্কা থাকত তবে বেসরকারি পুঁজির মালিকরা কখনোই তাতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসত না। এতদিন এই সমস্ত ক্ষেত্রে মাথাভারি প্রশাসন, চুরি, দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ইত্যাদি কোন কিছুই বন্ধ করার চেষ্টা করেনি রাজ্য সরকার।

সিপিএম যে আজ শুধু শিল্পসংস্থাগুলির পুনর্গঠনেই বিদেশি পুঁজিকে আহ্বান করছে তা নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মত পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিকেও বিদেশি পুঁজির শর্ত মেনে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। রাজ্যের মহকুমা হাসপাতাল ও স্টেট জেনারেল হাসপাতালগুলিতে 'সংস্কারের' জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের প্রথম দফার ঋণ প্রকল্পের শর্ত হিসাবেই সেগুলিতে সরকারি বরাদ্দ কমানো, ওষুধ কমিয়ে দেওয়া, চার্জ চালু করার মতো 'উন্নয়নের' কাজ হয়েছে। দ্বিতীয় দফার বলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি। এগুলি 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে'র নামে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র সেচে ১১০০ কোটি টাকার বিশ্বব্যাঙ্কের একটি ঋণ প্রকল্প চালু হতে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ডি পি ই পি এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের নামে সিপিএম দীর্ঘদিন ধরেই ব্রিটিশ সংস্থা ডি এফ আই ডি-র ঋণ নিয়ে চলেছে। সিপিএম নেতারা মুখে উন্নয়নের যত কথাই বলুক না কেন, আসলে দেশি-বিদেশি মালিকদের পুঁজি বিনিয়োগ করার, ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়াই এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য— যা বিদেশি ঋণেরও অন্যতম শর্ত।

সম্প্রতি রাজ্য সরকারের শিল্প পুনর্গঠন দপ্তর এবং ডি এফ আই ডি যৌথভাবে সরকারি সংস্থার পুনর্গঠন নিয়ে এক 'জাতীয় ওয়ার্কশপের' আয়োজন করেছিল। সেখানে রাজ্যের প্রতিনিধিদের সাথে অর্থলগ্নীকারী সংস্থার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ডি এফ আই ডি-র উপঅধিকর্তা হাওয়ার্ড টেলর মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের পুনর্গঠন কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রশংসা করাই স্বাভাবিক। কারণ পুনর্গঠনের নামে সরকার যতই সরকারি ক্ষেত্রগুলি থেকে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করবে ততই বহুজাতিক সংস্থাগুলির পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ বাড়বে এবং প্রবল বাজার সংকটে জর্জরিত লগ্নিপুঁজি সাময়িকভাবে হলেও শ্বাস নেওয়ার সুযোগ পাবে। বাস্তবে ঘটছেও তাই। হাজার হাজার কোটি টাকার অলস পুঁজি এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে তারা বিনিয়োগ করছে। তাই প্রশংসার এত ঘটা!

কিন্তু এই বিদেশি ঋণের ফাঁস কীভাবে দেশের সাধারণ মানুষের গলায় এঁটে বসে তার অসংখ্য উদাহরণ যেমন ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার দেশে দেশে বা বিশ্বের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে আছে, তেমনই আমাদের দেশেও যে সমস্ত রাজ্য উন্নয়নের ফানুস উড়িয়ে এই ঋণ নিয়েছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই সেইসব রাজ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে সেই ফানুস। 'উন্নয়নের মূল্য' প্রাণ দিয়ে চুকিয়ে দিতে হচ্ছে সেখানকার শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষকে। সকলেই জানেন, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মতোই এক সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে 'উন্নয়নের প্রতীক' হিসাবে তুলে ধরেছিল বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমগুলি। সম্প্রতি ব্রিটেনের একটি সংস্থা 'ক্রিশ্চিয়ান এইড' ডি এফ আই ডি-র ঋণের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ব্রিটেনের ব্লেয়ার সরকারের কাছেই অভিযোগ জানিয়েছে, ''ব্রিটেনের করদাতাদের পয়সা ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষকদের আত্মহত্যার দিকে *ঠেলে* দেওয়া এবং শ্রমিক কর্মচারীদের রোজগার কেড়ে নেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।'' উল্লেখ্য যে, নাইডু সরকার কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের নামে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েছিল ডি এফ আই ডি থেকে। ঋণের অন্যতম শর্ত হিসাবে সরকার ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে কৃষকদের ধান গমের উৎপাদন ছেড়ে রপ্তানিযোগ্য তৈলবীজ ও চিনি উৎপাদনে যেতে বাধ্য করে। অন্ধ্রের গরিব কৃষকেরা সে কাজে নেমে বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ, বিদ্যুতের বিপুল খরচ যোগাতে মহাজনদের ঋণের খপ্পরে পড়ে যায়। যার পরিণতিতে এই পাঁচ বছরে ঐ রাজ্যে পাঁচ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করে। উক্ত সংস্থাটি জানিয়েছে, ডি এফ আই ডি আসলে আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের নীতিকেই সে রাজ্যে কার্যকর করেছিল। ফলে এ রাজ্যেও সিপিএমের এই বিদেশি ঋণের ফল অন্যরকম কিছু হবে, এমন বলা জেনেশুনে জনগণের প্রতি চরম প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। এ রাজ্যে ইতিমধ্যেই সূর্যমুখী, টমেটো প্রভৃতি তথাকথিত অর্থকরী ফসল চাষ করতে গিয়ে বহু চাষী সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এমনকী আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। এই ভবিষ্যত কুফল সম্পর্কে সিপিএম নেতারা অজ্ঞ এমন ভাবার কোন কারণ নেই। এর সমস্ত পরিণতির কথা জেনেই তাঁরা এটা করছেন। রাজ্যের মানুষকে এর জন্য যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, তার বিনিময়ে তাঁদের গদি অটুট থাকলেই হল। রাজ্যের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য তাঁরা কত উদ্বিগ্ন তা তাঁদের গত তিন দশকের শাসনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

সিপিএম অতীতে যখন গণআন্দোলনে ছিল তখন বিশ্বব্যাঙ্কের মত প্রতিষ্ঠানগুলির পিছনে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থ কীভাবে কাজ করে, তা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করত এবং এখনও তাদের দলের কাগজে কখনও কখনও এ নিয়ে প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। বর্তমান কংগ্রেস সরকার আসার পরও সিপিএমের প্রবীণ নেতা, পলিটব্যুরো সদস্য জ্যোতি বসুর অভিযোগ ছিল, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া 'বিশ্বব্যাঙ্কের লোক'। কারণ যোজনা কমিশনে বিদেশি প্রতিনিধিদের পরামর্শদাতা হিসাবে যুক্ত করার প্রস্তাবের সমর্থনে মন্টেক সিং যুক্তি করেছিলেন। তাহলে আজ হঠাৎ কী ঘটল যে বিশ্বব্যাঙ্ক সহ বিদেশি অর্থলগ্নীকারী সংস্থাগুলি সিপিএমের বন্ধু হয়ে উঠল এবং এমনকী 'সহজ শর্তে' ঋণ দিতেও রাজি হয়ে গেল!

বাস্তবে সত্যিই তেমন কিছু ঘটেনি, বরং বিশ্বজুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর উপর মালিকশ্রেণীর শোষণ আক্রমণ আরও তীব্র হয়েছে। আসলে সিপিএমের এতদিনের বিরোধিতাটাই ছিল মেকি; শ্রেণীদ্বন্দ্বের

চারের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

এক্স-রে মেশিন লোপাট — প্রতিবাদে বিক্ষোভ ডেপুটেশন

চুরি হয়ে গেছে আস্ত একটা এক্স-রে মেশিন — মথুরাপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে! কবে? কেউ জানে না।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার প্রতিনিধিরা গত ৬ জুন মেডিকেল অফিসারকে এ বিষয়ে ডেপুটেশন দিতে গেলে তিনি জানান, মেশিনটা চালু ছিল, কিন্তু নতুন ঘরের ব্যবস্থা না হওয়ায় ভাঙচোরা ঘরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। হাসপাতালে নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা না থাকায় দরজা জানালা মায় অক্সিজেন সিলিণ্ডার চুরি হয়ে যাচ্ছে, মহিলা ওয়ার্ডে নিরাপত্তা নেই। তিনি নাকি এসমস্ত ঘটনা থানার ওসি, এসডিপিও, বিডিও, সিএমওএইচ প্রমুখকে বারবার জানিয়েছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

ডাঃ হান্নান হালদার ও মাধবী প্রামাণিকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা বিএমওএইচকে বলেন, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই ধরনের অপরাধমূলক অবহেলা চলতে পারে না। অবিলম্বে এক্স-রে মেশিন উদ্ধার করে সুষ্ঠু পরিষেবা চালু করা এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা না হলে জনগণ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার দাবিতে বহরমপুর হাসপাতালে বিক্ষোভ

হাসপাতালের বেসরকারীকরণ ও চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বেডভাড়া ও পথ্যের মূল্য প্রত্যাহার, ব্লাডব্যাঙ্ক স্থাপন, চব্বিশ ঘণ্টা ই সি জি এবং এক্স-রে চালু রাখা, নিয়মিত জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা, হাসপাতালের অভ্যন্তর নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, লোডশেডিং এর সময় ওয়ার্ডে জেনারেটারে আলো ও পাখা চালানো, সদর হাসপাতালকে তুলে না দেওয়া এবং বহরমপুরের দুটি হাসপাতালকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ করা প্রভৃতি দাবিতে 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' ২৭ মে বহরমপুর সদর হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান করে এবং হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি দেয়। বিক্ষোভ অবস্থানে বক্তব্য রাখেন বহরমপুর শহরের প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ প্রণব সেন, ডাঃ সামসুল হক ও সাজেম আলী প্রমুখ।

মেদিনীপুরে ডি ওয়াই ও'র বিক্ষোভ

সকল বেকারকে কাজ অথবা বেকার ভাতা দেওয়া, জেলার সরকারি ও আধাসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদে চুক্তির ভিত্তিতে নয়, স্থায়ী নিয়োগ করা এবং মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করার দাবিতে এ আই ডি ওয়াই ও'র মেদিনীপুর জেলা কমিটির আহ্বানে গত ৩ জুন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন শতাধিক যুবক তমলুক হাসপাতাল মোড়ে এক বিক্ষোভ সভায় সমবেত হন। সভায় বক্তব্য রাখেন দেবদত্ত পণ্ডা, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাসুদেব সামন্ত, চন্দন সামন্ত, জেলা সম্পাদক তমাল সামন্ত প্রমুখ। বাসুদেব সামন্তের নেতৃত্বে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। সভার শেষে হাসপাতাল মোড়ে মদের প্রতীকী বোতল পোড়ানো হয় এবং একটি বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

রাতের অন্ধকারে নির্মম লাঠিচার্জ

একের পাতার পর

ফুটিয়ে তুলেছে।

ছাত্রছাত্রীরা কোন হিংসাত্মক বা কোন বিপজ্জনক আন্দোলন করেনি যে, তাকে দমন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে এমন রক্তাক্ত করে দিতে হবে। তারা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে অনশন আন্দোলন করছিল। তাহলে কি সরকার বলতে চায় যে, আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে অনশন করবার অধিকারও ছাত্রছাত্রীদের নেই? এর নাম গণতন্ত্র? এর নাম বামপন্থা? তাহলে ফ্যাসিবাদ কাকে বলে? কংগ্রেস আমলে আন্দোলন ভাঙতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যে বামপন্থী আন্দোলন গর্জে উঠেছিল, তার অন্যতম শরিক সেদিন ছিল আজকের ক্ষমতাসীন সি পি এম। সেই সি পি এমই আজ সরকারে বসে কংগ্রেসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অমিতবিক্রমে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ঢুকিয়ে দিয়ে আন্দোলন ভাঙছে, ছাত্রছাত্রীদের লাঠিপেটা করে হাসপাতালে পাঠাচ্ছে, ছাত্রীদের শালীনতা হরণ করছে — যার মধ্য দিয়ে তারা শুধু বামপন্থার মহত্ত্বকে কালিমালিপ্ত করছে তাই নয়, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে দেশে ফ্যাসিবাদ নিয়ে আসার পথকেই সুগম করছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে কেন্দ্র করে চলতে থাকা আন্দোলনকে ভাঙতে উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার ৫ জন ছাত্রের নামে অশোভন আচরণের অভিযোগ তুলে তাদেরকে সাসপেন্ড করে দেন। ৭ দিন অনশন চলার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে চাপের সামনে পড়ে তার মোকাবিলা করতেই তারা রাতের অন্ধকারে ছাত্র আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেবার ছক কষে এবং সেই ছক অনুযায়ী ১০ জুন রাতে পুলিশ অনশনকারীদের উপর এমন বর্বরোচিত তাণ্ডব চালায়।

ঘটনার পরদিন ১১ জুন ছাত্রসংগঠন ডি এস ও, যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও এবং মহিলা সংগঠন এম এস এস যাদবপুর থানায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে। ডি এস ও-র আহ্বানে ১৩ জুন রাজ্য জুড়ে পালিত হয়েছে প্রতিবাদ দিবস। ডি এস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের পদত্যাগ দাবি করেছে।

আমরা মনে করি, সি পি এমের মত স্বেচ্ছাচারী, গণআন্দোলন বিরোধী শক্তিকে দাবি মানাতে বাধ্য করতে হলে প্রয়োজন আরও ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনকে জোরদার করা।

ডি এস ও'র বিবৃতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনরত ছাত্রদের উপর পুলিশি বর্বরতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এ আই ডি এস ও রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল ১১ জুন এক প্রেস বিবৃতিতে জানান ঃ

গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ জুন মধ্যরাতে অনশনরত ছাত্র ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত হামলার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। মহাকরণের নির্দেশে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের পুলিশ যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে, হাসপাতালে এমনকী ছাত্রীদেরও নিগ্রহ করেছে তার জন্য আমরা সারা রাজ্যে ১৩ জুন প্রতিবাদ দিবস পালন করার জন্য ছাত্রসমাজের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা দাবি করছি—

১। অবিলম্বে নিঃশর্তে ছাত্রদের উপর থেকে অন্যায় সাসপেনশনের আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে;

২। ছাত্রছাত্রীদের নিগ্রহ করতে পুলিশ ডেকে আনার জন্য উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে পদত্যাগ করতে হবে;

৩। দোষী পুলিশদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

রাসবিহারী-আলিপুর লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড শঙ্কর ব্যানার্জী স্বল্প রোগভোগের পর গত ৩১ মে রাত সাড়ে দশটায় দক্ষিণ কলকাতার অরবিন্দ সেবা কেন্দ্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার জয়নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড শচীন ব্যানার্জীর হাতে গড়া 'শান্তি সংঘ'-এর সাথে যুক্ত হয়ে খেলাধূলা-সংস্কৃতি চর্চা থেকে শুরু করে সংঘের প্রায় সমস্ত বিষয়েই তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। পাশাপাশি কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সান্নিধ্যে শুরু হয় তাঁর বিপ্লবী রাজনীতির অনুশীলন এবং পর্যায়ক্রমে দলের একজন অনুগত সৈনিক হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে তিনি লিপ্ত হন।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই রোজগারের পথ তাঁকে বেছে নিতে হয়। কিন্তু সরকারি চাকুরির বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সাথে সাথে নেতৃত্বের নির্দেশে দলের মুখপত্র গণদাবীর সংবাদ সংগ্রাহকের ভূমিকা দীর্ঘদিন পালন করেছেন। পরবর্তীকালে কালীঘাট এলাকায় দলের কাজকর্মে নিজেকে যুক্ত করেন। এই সময় থেকেই এলাকার অনগ্রসর মানুষের মধ্যে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা তথা বিপ্লবী রাজনীতি প্রসারে স্থানীয় সমাজসেবামূলক সংগঠন 'শরৎ পাঠাগার' পরিচালনায় উদ্যোগী হন। শরৎ পাঠাগারের মাধ্যমে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি কোচিং, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে ছিল তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। একই সাথে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, চক্ষু চিকিৎসা শিবির পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় কালীঘাট অঞ্চলে 'শরৎ পাঠাগার' বিশেষ সুনাম অর্জন করে। ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক-স্থানীয় অধিবাসী নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তিনি পেয়েছেন। দলের কর্মীদের প্রতি ছিল তাঁর অসীম স্নেহ। তাই পরদিন স্থানীয় কার্যালয়ে তাঁর মরদেহ আনা হলে কর্মী-সমর্থক ছাড়াও শত শত মানুষ হাজির হয়েছিলেন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে, ব্যথা-বেদনা বুকে নিয়ে সামিল হয়েছেন তাঁর মরদেহ নিয়ে মিছিল পরিক্রমায়।

প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান, দলের রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ কমরেডস্ সাধনা চৌধুরী, বিধান চ্যাটার্জী, চিররঞ্জন চক্রবর্তী ; কলকাতা জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ কমরেডস্ চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কমরেড কে জি সাহা ; রাসবিহারী-আলিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদিকা কমরেড করুণা ভট্টাচার্য প্রমুখ। অন্যান্য গণসংগঠন এবং শরৎ পাঠাগারের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা তাঁর প্রতি লাল সেলাম জানিয়ে শেষ বিদায় জানান।

গত ৬ জুন সন্ধ্যায় যথাযথ মর্যাদা এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে কালীঘাট রোডে কমরেড শঙ্কর ব্যানার্জী স্মরণে অনুষ্ঠিত সভায় প্রয়াত কমরেডের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ ও শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড সাধনা চৌধুরী, কমরেড করুণা ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

উত্তর ২৪ পরগণা

ধর্ষণকারীর গ্রেপ্তারের দাবিতে এম এস এস-এর বিক্ষোভ

২ জুন অশোকনগর থানার বাঁশপুল অঞ্চলের ভাতশালা গ্রামে ১১ বছরের এক নাবালিকা ধর্ষিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় পাড়ার যুবক মসিয়ার মণ্ডল মেয়েটিকে চোখ-মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায় বাড়ির অদূরেই এক ঝিঙে ক্ষেতে। রাত ১০-৩০টা নাগাদ তার পরিজন চোখ-মুখ, হাত-পা বাঁধা, বিবস্ত্র, রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। মেয়েটি চতুর্থশ্রেণীর ছাত্রী এবং পিতৃহীন। মা পরিচারিকার কাজ করে দুই মেয়েকে নিয়ে অতি দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার চালান। অসহায় মা ঐ দিন রাতেই ঘটনা জানিয়ে অশোকনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ ঘটনার চারদিন পরেও অপরাধীকে গ্রেপ্তার এবং অসুস্থ নাবালিকার সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করেনি। ইতিমধ্যে আসামী গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের অশোকনগর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে গত ৬ জুন পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার, কঠোর শাস্তি ও মেয়েটির সুচিকিৎসার দাবিতে প্রায় শতাধিক মহিলা অশোকনগর থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ চলে টানা দু'ঘণ্টা। বিক্ষোভের চাপে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তখনই ধর্ষিতার চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। অবিলম্বে আসামীকে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না হলে আন্দোলন আরও জঙ্গিরূপ নেবে বলে সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড শিবানী হালদার জানান।

মুর্শিদাবাদ

ডোমকলে ঋণগ্রহীতাদের বিক্ষোভ ডেপুটেশন

সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগে স্বনিযুক্তি প্রকল্পভুক্ত শতাধিক যুবক-যুবতী গত ৩০ মে মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছায় এবং সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাসের নেতৃত্বে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেয়। সেখানে এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন ডোমকল ব্লক সভাপতি আব্দুস সালাম, আব্দুল খালেক, আব্দুর রসিদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রাজ্য সম্পাদক ঐ পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এস ডি ও তাঁদের দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। দাবিগুলির অন্যতম ছিল স্বনিযুক্তি প্রকল্পভুক্ত যুবকদের উপর পুলিশি ও প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করতে হবে, সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, বিকল্প কাজের মাধ্যমে প্রকল্পের টাকা পরিশোধ করার সুযোগ দিতে হবে এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় শ্রমনির্ভর শিল্পস্থাপন করে সকল কর্মক্ষম বেকারের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ছে

একের পাতার পর

ডিজেলের দাম বাড়াতেই হবে, না বাড়িয়ে কোন উপায় নেই, এমন বাধ্যবাধকতা অর্থনৈতিক দিক থেকে নেই।

বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল ২০০৪ সালের অক্টোবরে। এ সময়ে দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ৫৩.২৫ মার্কিন ডলার। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি আয় ও তেল কোম্পানিগুলির মুনাফা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ৪ নভেম্বর ২০০৪ পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ২.২৭ টাকা, ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ২.২১ টাকা এবং রান্নার গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় সিলিণ্ডার পিছু ২০ টাকা বাড়িয়ে দেয়। তারপরই বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম নামতে থাকে। চাপে পড়ে সরকার শুধু পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ১.২১ টাকা কমায়। কিন্তু ডিজেল ও গ্যাসের দাম না কমিয়ে যা বাড়ানো হয়েছিল তাই রেখে দেয়। অথচ সকলেই জানেন, ডিজেল ও গ্যাসের দামের সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সবচেয়ে বেশি জড়িত। এর দ্বারা দেশের মানুষকে চরম আর্থিক কষ্টের দিকে ঠেলে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তেল কোম্পানিগুলিকে বাড়তি লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছে এবং তেলের ওপর কর বাবদ সরকারি আয় বাড়িয়ে নিয়েছে। তাহলে এই সরকার কাদের স্বার্থে চলছে এবং সিপিএম কাদের স্বার্থে এই সরকারকে সমর্থন করছে তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় কি?

বর্তমানে (৮ জুন ২০০৫) বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ব্যারেল পিছু ৫৩ মার্কিন ডলার, যা ২০০৪ সালের অক্টোবরের ৫৩.২৫ ডলারের চেয়েও কম। আগেই বলা হয়েছে, ব্যারেল পিছু এই ৫৩.২৫ ডলার দামকে ভিত্তি করেই ইতিপূর্বেই ৪ নভেম্বর ২০০৪ জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছিল ও সেই দরই (পেট্রল বাদে) এখনও বলবৎ আছে। তাহলে ব্যারেল পিছু দাম এখন ৫৩ ডলার হওয়ার কারণে আবার জ্বালানি তেলের দাম বাড়াবার প্রশ্ন আসছে কেন? ২০০৪ সালের শেষ দিকে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম ৫৩ ডলার ছাড়াবার পরও ওই বছরই ইন্ডিয়ান অয়েল ৪৮৯১ কোটি টাকা, ও এন জি সি ১২,৭২৫ কোটি টাকা লাভ করেছিল। ও এন জি সি-র লাভ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৩ শতাংশ বেড়েছিল ২০০৪ সালে (সূত্র ঃ আজকাল ৭.৬.০৫)। গত নভেম্বরে ভারতে পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়াবার পর বিশ্ববাজারে তেলের দাম নামলেও সেই একই বর্ধিত দাম রেখে দেওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তেল কোম্পানিগুলি বাড়তি লাভ করতে থাকে। ডিজেলে লাভ লিটার প্রতি ১.৪০ টাকা দাঁড়ায়। সম্প্রতি দাম আবার কিছুটা বাড়ার ফলে বর্তমানে লিটার প্রতি লাভ হচ্ছে ৭৫/৮০ পয়সা (সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস, ৩-৬-০৫), অর্থাৎ লোকসান মোটেই হচ্ছে না, লাভ কিছুটা কমেছে। কিন্তু গত বছরের বাড়তি লাভটাকেই স্বাভাবিক লাভ বলে দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অজুহাত দিচ্ছে তেল কোম্পানিগুলির লোকসান হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে কোন লোকসান হচ্ছে না।

তাছাড়া বিশ্ববাজারে যে দরে তেল বিক্রি হয় ভারত সেই দরে তেল কেনে না। পশ্চিমের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব দাম-মার্কার আছে, ইউরোপীয় দেশগুলির নিজস্ব মার্কার আছে, কিন্তু এশীয় দেশগুলির নিজস্ব মার্কার নেই। উন্নত দেশগুলির ক্রয়মূল্যে কিছু ছাড় বা কিছু বাড়তি দিয়ে এশীয় দেশের অশোধিত তেলের দর নির্দিষ্ট হয় (সূত্র ইকনমিক টাইমস, ৭-১-০৫)। এশীয়, বিশেষত ভারতের ক্ষেত্রে এই ছাড় কতটা তা সর্বদা বলা হয় না। এখানে সংবাদপত্রে বিশ্ববাজারের দর বলতে মার্কিন লাইট ক্রুড বা ব্রেন্ট মার্কারের দরটিই বলা হয়। গত বছর ডিসেম্বরে বিশ্ববাজারের দর যখন ব্যারেল পিছু ৪২ ডলার ছিল তখন ভারত তেল কিনেছে ৩৭ ডলার দরে, অর্থাৎ প্রায় ১২ শতাংশ কমে। কাজেই বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম অঙ্কের হিসাবে কত তা দিয়ে সবকিছু বোঝা যায় না।

এর উপর আছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাপানো বিপুল করভার। পেট্রলের উপর রাজ্য সরকারের বিক্রয় কর ২৫ শতাংশ, ডিজেল ১৭ শতাংশ; এর উপর আছে সেস। বাজারে পেট্রলের দাম যখন লিটার প্রতি ৪০.৮৯ টাকা ও ডিজেলের ২৮.৭২ টাকা তখন কেন্দ্রের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মণিশঙ্কর আয়ার বলছেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের সবরকম কর তুলে নিলে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ১৭.৪৬ টাকা ও ডিজেলের দাম ১৮.০৭ টাকা দাঁড়াবে (সূত্র প্রতিদিন ৮-১২-০৪); অর্থাৎ পেট্রলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মোট কর লিটার প্রতি ২৩.৪৩ টাকা এবং ডিজেলের উপর লিটার প্রতি ১০.৬৫ টাকা; অর্থাৎ পেট্রলে ১৩৪ শতাংশ ও ডিজেলে ৫৮ শতাংশ। এই বিপুল করের পরিমাণ দেখলেই বোঝা যায় জ্বালানি তেলের দাম বাড়াতে সরকারের এত আগ্রহ কেন।

কর বৃদ্ধি ও মুনাফাবৃদ্ধির স্বার্থেই তেলের দরবৃদ্ধির প্রস্তাব

তেলের দাম বাড়লেই পণ্য পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধি, বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে ঘুরপথে সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যায়। কিন্তু তেলের দাম বাড়লে সমস্ত জিনিসের দামের ওপর তার যে প্রভাব পড়ে তা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। একমাত্র ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি বাসের ভাড়া বাড়ে তবেই মানুষ সরাসরি আক্রমণটা বুঝতে পারে। কিন্তু ইদানীং ধূর্ত রাজ্য সরকারগুলি, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার একবারে বাসের ভাড়া এত বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তার ফলে বাস মালিকদের এত অতিরিক্ত মুনাফা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে, যাতে তেলের দাম খানিকটা বাড়লেও বাসের ভাড়া বারবার না বাড়াতে হয়। এতে মালিকদেরও খুশি রাখা যায়, আবার জনদরদিও সাজা যায়। তেল থেকে সরকারের কর বাবদ কত আয় হয়? ২০০৩ সালের প্রথম ছ-মাসে এই বাবদ সরকারের আয় হয়েছিল ৫০,০০০ কোটি টাকা। ২০০৪ সালের প্রথম ৬ মাসে তা বেড়ে হয়েছে ৯০,০০০ কোটি টাকা। (সূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান ১৩-১১-০৪)। যে সরকার মালিকশ্রেণীকে অকাতরে কর ছাড় দেয়, তারাই কীভাবে জনগণের ঘাড় ভেঙে হাজার হাজার কোটি টাকা কর আদায় করে সেই টাকা যুদ্ধসজ্জায়, মাথাভারি প্রশাসনের পিছনে এবং মন্ত্রী আমলাদের বিলাস বসন ভ্রমণে উড়িয়ে দেয় বা আত্মসাৎ করে, জ্বালানি তেলের ওপর বিপুল কর তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এর সাথে রয়েছে একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির মুনাফার স্বার্থ। একথা মনে রাখা দরকার, পুঁজি-মুনাফা ও ব্যবসার পরিমাণের নিরিখে ভারতীয় একচেটিয়া তেল কোম্পানি ও এন জি সি, ইন্ডিয়ান অয়েল প্রভৃতির স্থান বিশ্বের প্রথম সারিতে। একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় পুঁজির মালিকানাধীন এই কোম্পানিগুলি শুধু দেশের তৈলক্ষেত্রগুলি থেকেই তেল তুলছে নয় ; পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া হয়ে রাশিয়ার সাখালিন তৈলক্ষেত্রের একাধিক তৈলকূপ কিনে ভারতীয় কোম্পানিগুলি ব্যবসা করছে। তাছাড়া দেশের তৈলক্ষেত্রগুলি থেকে যে তেল এরা তোলে তা দেশের বাজারেও আন্তর্জাতিক দামে বিক্রি করে হাজার হাজার কোটি টাকা এরা মুনাফা করে। ও এন জি সি-র চীফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর একটা মোটামুটি হিসাব দিয়ে বলেছেন — বিশ্ববাজারে এক ডলার দাম বাড়লে ও এন জি সির আয় বাড়ে বছরে ৯০০ কোটি টাকা। এর অন্যতম কারণ হল, বিশ্ববাজারে দর বাড়লে দেশীয় তৈলকূপগুলি থেকে তোলা তেলের দামও বেড়ে যায়। তাছাড়াও, দেখা যায়, বিশ্ববাজারে যতটা দাম বাড়ে, দেশের বাজারে সবসময়েই তার চেয়ে বেশি দাম বাড়ানো হয়; যেমন, ২০০৩ সালে বিশ্ববাজারে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ১০.১৩ টাকা ছিল; সেটা ২০০৪-এর নভেম্বর এসে ১৫.৫৩ টাকা হয়, অর্থাৎ দাম বাড়ে প্রতি লিটারে ৫.৪০ টাকা। অথচ দেশের বাজারে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ৩৩.৬১ টাকা থেকে ৪২.১০ টাকা করা হয়, অর্থাৎ এদেশে দাম বাড়ানো হয় ৮.৪৯ টাকা। ডিজেলের ক্ষেত্রে এই সময়ে বিশ্ববাজারে দাম লিটার প্রতি ৬.৭৩ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বাজারে ডিজেলের দাম ৮.৮৬ টাকা বাড়ানো হয়। (সূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান ১৩-১১-০৪)। এইভাবে বিশ্ববাজারে ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় দেশের বাজারে বিক্রয়মূল্য অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেওয়ায় কর বাবদ সরকারের আয় যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে সরকারি ও বেসরকারি (যেমন রিলায়েন্স) একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির মুনাফা।

আগেই বলা হয়েছে, পেট্রল, বিশেষত ডিজেলের দর বাড়লে কৃষি-শিল্প-পরিষেবা অর্থাৎ অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। তার উপর আমাদের দেশে পেট্রল- ডিজেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি। সামরিক বাহিনীর জন্য, সরকারি বিমান, রেল ও যাত্রী পরিবহন ব্যবসা এবং একজন মন্ত্রীর সঙ্গে লম্বা গাড়ির কনভয় চালাতে সরকার নিজেই প্রচুর তেল কেনে। এর সমস্ত চাপটাই পড়ে জনসাধারণের ঘাড়ে। কিন্তু এও সত্য যে তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির যে চাপ আসে তা তেল ব্যতীত অন্যান্য শিল্পমালিকদের পক্ষে, যেমন পণ্য পরিবহন শিল্পমালিকদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়; কারণ খরচ বৃদ্ধির ফলে তাদের যে দামটা বাড়াতে হয় তাতে তাদের মুনাফা বিশেষ বাড়ে না। যেসব পণ্যের বাজার মন্দা সেইসব শিল্পমালিকরাও পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি চায় না। তাই তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নে শাসকদের মধ্যে, বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ শিল্পমালিকদের গোষ্ঠীগুলি নিজস্ব মুনাফার স্বার্থে কেউ কেউ যেমন দাম বাড়াবার জন্য চাপ দেয়, তেমনি কেউ কেউ প্রচলিত দাম বজায় রাখার জন্য চাপ দেয়। কাজেই কোন বুর্জোয়া সরকার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াতে বিলম্ব ও দ্বিধা করছে মানেই সে জনস্বার্থ দেখছে, জনগণকে খুশি রাখতে চাইছে — এটা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে মালিকশ্রেণীর স্বার্থের মধ্যেই গোষ্ঠীগত বিশেষ সুবিধার যে চাপাচাপি থাকে, রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক দলগুলির দাবির মধ্যে তার ছাপ থাকে। যেমন এখন সিপিএম পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধতা করছে। কিন্তু, তারা বলছে না, বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতটা ভুয়ো, বলছে না কীভাবে একচেটিয়া ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক মালটিন্যাশনালের স্তরে পৌঁছেছে। তারা দেশীয় তৈলক্ষেত্র থেকে তোলা তেল আন্তর্জাতিক দামে বেচা বন্ধ করতে বলছে না এবং জরুরি পরিষেবা ক্ষেত্রে এই তেল সস্তা দরে দিতেও বলছে না। অর্থাৎ একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির মুনাফার স্বার্থ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় এমন দাবি তারা তুলছে না। তারা সরকারি করকাঠামোর রদবদল ঘটিয়ে তেলের প্রচলিত দাম বজায় রাখতে বলছে। সরকারি কর কমিয়ে পেট্রোপণ্যের দামে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার যে দাবি তারা তুলছে, সে সম্পর্কে যদি তারা আন্তরিক হতো তবে নিজেরা যেখানে ক্ষমতাসীন সেই রাজ্যে পেট্রোপণ্যের ওপর রাজ্য সরকারের কর কমিয়ে তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারতো। কিন্তু তা তারা করছে না, বলছে — কেন্দ্রকে কর কমাতে হবে। এখন যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব সিপিএমের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়ে জনস্বার্থে দাবি আদায় করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। কিন্তু যেহেতু জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মালিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে এবং নিজেরাও রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় বসে একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থ দেখছে, তাই নীতিগতভাবে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির যে কুযুক্তি কেন্দ্রীয় সরকার তুলছে — রাজ্য সরকার কেবল কর কমানোর দাবি তুলে কেন্দ্রের সেই কুযুক্তিকেই কার্যত স্বীকৃতি দিচ্ছে।

মাত্র আট মাস আগেই পেট্রল-ডিজেল-গ্যাসের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়াবার পর আবারও বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দামবৃদ্ধিকে অজুহাত করে দ্বিতীয়বার দাম বাড়াবার যে তোড়জোড় ইউ পি এ সরকার করছে তার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নেই। কারণ, আগেরবার দাম বেড়ে যা দাঁড়িয়েছিল, পরে তা কমে গিয়ে এবারে আবার যা বেড়েছে তা আগের বারের বর্ধিত দামের তুলনায় কম। ফলে আগেরবার সরকার দেশে তেলের দাম যা বাড়িয়েছিল সেই বর্ধিত দামের উপর আবার দাম বাড়ানোর কোনও কারণ নেই। এ জিনিস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে ১। জনবিরোধী আর্থিক নীতির প্রশ্নে পূর্বতন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার ও বর্তমান সি পি এম সমর্থিত কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার একই পথে হাঁটছে শুধু নয়, জনগণের উপর ক্রমাগত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে মালিকশ্রেণীকে তুষ্ট করতে কে কত বেশি পারদর্শী

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদেশি পুঁজির শর্ত মেনেই বিলগ্নীকরণ হচ্ছে

দুয়ের পাতার পর

ভিত্তিতে, শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ স্বার্থে সে বিরোধিতা ছিল না। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে জনপ্রিয়তা অর্জন এবং শেষপর্যন্ত গদি দখলের লক্ষ্যেই ছিল সেই বিরোধিতা। কমিউনিস্ট হওয়া তো দূরের কথা, ন্যূনতম বামপন্থা অবশিষ্ট থাকলেও এমন করে মালিকশ্রেণীর কাছে তারা নতজানু হতে পারত না, মালিকশ্রেণীর তীব্র আক্রমণের সামনে শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের স্বার্থকে এমন করে বলি দিতে পারত না। শ্রমিকশ্রেণীকে এই আক্রমণের মুখে রক্ষা করতে না পারলেও নিজেদেরকে মালিকশ্রেণীর আক্রমণের হাতিয়ারে পরিণত করতে পারত না। পুঁজিবাদ আজ সর্বত্র তীব্র সংকটে জর্জরিত। সমাজজুড়ে শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্ররূপ ধারণ করছে। এই অবস্থায় বিশ্বজুড়েই সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিগুলি তাদের শ্রমিক দরদের আলখাল্লা খুলে ফেলে সরাসরি মালিকশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করছে। আমাদের দেশেও সিপিএম, সিপিআই-এর মতো দলগুলি আজ সেই ভূমিকায়। যাঁরা আজ শোষিত মানুষের এই দুরবস্থা দেখে সত্যিই ব্যথিত, তাঁদের বুঝতে হবে, 'উন্নয়ন' কথাটির এমনি কোন মানে নেই, হয় তা শোষিত শ্রেণীর স্বার্থে উন্নয়ন, না হয় তা মালিকশ্রেণীর স্বার্থে উন্নয়ন। শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের উন্নয়ন বলে কিছু হয় না। এই কথাটাই আজ সিপিএম দেশের মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে, কিন্তু দেশের মেহনতি মানুষকে তা ভুললে চলবে না।

সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ কীসের জোরে দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল

(মহান নেতা স্ট্যালিনের আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে বলীয়ান দুর্ধর্ষ জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীকে শেষপর্যন্ত ঠিক কীসের জোরে এবং কেমনভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, শুধু সোভিয়েট ভূখণ্ড নয় — ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিকেও ফ্যাসিস্ট-দখলমুক্ত করেছিল, সেদিনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও জনগণের প্রতি নেতার আস্থা ও বিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল — সেই ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। সোভিয়েটের জনগণ সমাজতন্ত্র চায়নি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙতে চেয়েছে, সেজন্যই সমাজতন্ত্র ভেঙেছে — এই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী প্রচারের মোকাবিলায় আমাদের জানা দরকার কীভাবে সোভিয়েট জনগণ সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়েছে। শোষিত জনগণ এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবীদের কাছে এ এক অমূল্য ইতিহাস — যা না জানলে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণাই অপূর্ণ থেকে যাবে, যা জানলে শোষণমুক্তির লড়াই আরো ধারালো হবে। এই লক্ষ্য থেকেই সেদিনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী)

দ্বিতীয় কিস্তি

সাম্রাজ্যবাদীদের ডলার-পুষ্ট ঐতিহাসিকরা নতুন করে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরজায়ের ইতিহাসে লিখছেন, কিন্তু তাঁরা ভুলেও এই প্রশ্নগুলির উত্তর করছেন না যে, (১) জাপান-জার্মানি-ইতালির সম্মিলিত জোটের বিরুদ্ধে এই পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি প্রথমেই কেন সংঘবদ্ধ জোট গঠন করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে রাজি হল না? যৌথ নিরাপত্তা গঠন সম্পর্কে সোভিয়েটের বারংবার আবেদনে সাড়া না দিয়ে তারা কেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে মদত দিল? কেন তারা জার্মানির সমরশিল্পে বিপুল অর্থ লগ্নী করে তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল? কেন বিভিন্ন দেশ দখলে ফ্যাসিস্টদের উৎসাহ জোগালো? ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স মিউনিকে কেন জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহায্য করল ? (২) ঐ ঐতিহাসিকরা এই প্রশ্নেরও জবাব দেন না যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন ফ্যাসিস্ট হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ লড়াই লড়ছে তখন তাদের বারবার আবেদন সত্ত্বেও বৃটেন ও আমেরিকা কেন পশ্চিম রণাঙ্গণে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলে হিটলার বাহিনীকে আক্রমণ করল না? বরং হিটলার যাতে তার সর্বশক্তি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে, দ্বিতীয় ফ্রন্ট না খোলার দ্বারা সেই ব্যবস্থাই তারা কেন করে দিল? (৩) সোভিয়েট যখন টানা তিন বছর অবরুদ্ধ থাকার পর শেষপর্যন্ত ঘুরে দাঁড়ালো এবং হিটলার বাহিনীর পরাজয় শুরু হল তখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কেন জার্মানি ও আমেরিকার সঙ্গে মিলিতভাবে সোভিয়েট আক্রমণের প্ল্যান ছকেছিল। ['রিয়া নোভস্তি' পত্রিকার মিলিটারি কমেন্টেটর ভিক্টর লিটোভকিন এক ইন্টারভিউতে (দি স্টেটসম্যান ৪-৫-০৫) বৃটেনের নিজস্ব ডকুমেন্ট থেকে প্রাপ্ত এই তথ্যটি তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।] (৪) পোল্যাণ্ড সীমান্তের যে আউশভিৎস কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পে বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে ধরে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করছে হিটলার, সেই মারণক্যাম্পের সঙ্গে যুক্ত রেললাইনটাকে অবিলম্বে বিমান আক্রমণের দ্বারা ধ্বংস করার জন্য সোভিয়েট অনুরোধ জানিয়ে ছিল; সোভিয়েটের পক্ষে সেখানে পৌঁছানোর পথ ছিল রুদ্ধ। বৃটেন ও আমেরিকা সোভিয়েটের সেই আবেদনে কর্ণপাতও করেনি; কেন? (৫) রুমানিয়ার যে পোলেইস্তি তৈলক্ষেত্র থেকে নাৎসিবাহিনীর যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় তেল সরবরাহ হচ্ছিল, সেই তৈলক্ষেত্রটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে নাৎসি বাহিনীকে গুরুতর আঘাত হানার জন্য সোভিয়েট ১৯৪১ সালে বৃটেন ও আমেরিকাকে বারবার অনুরোধ করেছিল এবং সেক্ষেত্রে ক্রিমিয়ার বিমান বন্দরও তাদের ব্যবহারের জন্য খুলে দিতে চেয়েছিল; কিন্তু তারা কর্ণপাতও করেনি। অথচ ১৯৪৪ সালে সোভিয়েট লালফৌজ যখন সেই তৈলক্ষেত্রের দখল নেওয়ার দিকে এগুচ্ছে, ঠিক তখনই বোমা মেরে সেটিকে উড়িয়ে দিল বৃটেন-আমেরিকার বিমান বাহিনী। এর নাম ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ, নাকি সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধ? (৬) লালফৌজ যখন বিজয় অভিযানে এগিয়ে চলেছে জার্মানির দিকে, তখন লালফৌজের গতি আটকাতে ড্রেসডেনে এলবে নদীর উপর বৃটেন-আমেরিকা ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে পেরুবার সমস্ত সেতু উড়িয়ে দিয়েছিল কেন? (৭) ওরেনিয়েনবুর্গে ছিল জার্মানির মূল্যবান পারমাণবিক গবেষণাগার; লালফৌজের অপ্রতিহত অভিযানে তা অচিরেই তাদের দখলে চলে যাবে — বুঝতে পেরে বৃটেন-আমেরিকার বিমানবাহিনী আচমকা সেই গবেষণাগার সহ কর্মরত সমস্ত বিজ্ঞানী, কর্মচারী ও যন্ত্রপাতি সমূহ ধ্বংস করে দিয়েছিল কী উদ্দেশ্যে? (৮) যুদ্ধ পরবর্তীকালে নাৎসি বাহিনীর চরম অত্যাচারী বড় বড় অফিসার এবং তাদের গোয়েন্দা বাহিনীর অফিসারেরা যুদ্ধাপরাধী হিসাবে যাদের শাস্তি প্রাপ্য ছিল, তারা গোপনে আশ্রয় লাভ করেছিল আমেরিকায়; পরবর্তীকালে জানা গিয়েছে এইসব যুদ্ধাপরাধীদের শয়তানি বুদ্ধিকে মার্কিন শাসকরা ব্যবহার করেছে বিভিন্ন দেশের উপর হানাদারি চালানোর ক্ষেত্রে। এটা কি ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের মার্কিন কৌশল?

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে সাম্রাজ্যবাদীদের মদত

বাস্তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ১৯৩১ সালে ; জাপ সাম্রাজ্যবাদ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে, কমিউনিজমের হাত থেকে এশিয়াকে বাঁচানোর অজুহাতে। দু-বছর পর ১৯৩৩ সালে ঐ একই অজুহাতে অর্থাৎ কমিউনিজমের গ্রাস থেকে জার্মানিকে উদ্ধার করতে হিটলার ক্ষমতাসীন হয়ে জার্মান প্রজাতন্ত্রের (ভাইমার রিপাবলিক) উচ্ছেদ করে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেন। ১৯৩৫ সালে একই যুক্তি তুলে ইটালি ইথিওপিয়া দখল করে।

''দেশমাতৃকা তোমাদের আহ্বান করছেন''

১৯১৪-১৮'র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানির উপর বিজয়ী ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স চাপিয়ে দিয়েছিল ভার্সাই চুক্তি; উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির আর্থিক ও সামরিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া। তবু সেই জার্মানি এত দ্রুত সামরিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী ও আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারল, তার অন্যতম কারণ একেবারে প্রথম থেকেই তারা ধারাবাহিকভাবে বৈদেশিক অর্থসাহায্যে পুষ্ট হয়েছিল। এই সহায়তার ক্ষেত্রে প্রথম নাম করতে হয় আমেরিকার। তারা জার্মান শিল্পে বিশেষত তাদের সমরাস্ত্র নির্মাণশিল্পে ব্যাপক অর্থলগ্নী করছিল। বৈদেশিক ঋণের ৭০ ভাগই ছিল আমেরিকার। হিটলার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আমেরিকা ও বৃটেনের পুঁজি স্রোতের মতো ঢুকছিল জার্মানির সমরশিল্পে। (সূত্র ঃ আত্মজীবনী ঃ মার্শাল অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন জি ঝুকভ...) হিটলারের জার্মানি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিশেষত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যেভাবে মাথা তুলছিল তাতে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড ভার্সাই চুক্তি একরকম তুলেই নিল এবং জার্মানি যাতে দ্রুত অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে, সেই সাহায্যই তারা করতে লাগল।

প্রথমত, যে 'সার' অঞ্চল নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির বিবাদ ছিল, ফ্রান্স সেটা জার্মানিকে ফিরিয়ে দিল ১৯৩৫ সালের প্রথমেই। কয়লাখানি সমৃদ্ধ এই সার অঞ্চলই হল জার্মানির শিল্পকেন্দ্রের প্রাণ। এর ১৫ দিন বাদেই হিটলার প্রকাশ্যে যখন ঘোষণা করলেন — ভার্সাই চুক্তি মানতে জার্মানি বাধ্য নয়, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স কেউ তখন বাধা দিল না, মৌখিক প্রতিবাদও করল না। এরপর 'জাতিসংঘ মানি না' — হুঙ্কার দিয়ে জার্মানি ও জাপান জাতিসংঘ ত্যাগ করল। তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন জাতিসংঘে প্রবেশ করে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধের চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানাল জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছে এবং তখন থেকেই তারা নাৎসিদের সংযত করার জন্য 'গণতন্ত্রী শক্তি-গুলি'র মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকে।

জার্মানির রাইনল্যাণ্ড ভার্সাই চুক্তি অনুসারে ছিল ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে, যদিও সেখানে উৎপাদনমূলক কাজকর্ম করত জার্মানি। ১৯৩৬-এর ৭ মার্চ হিটলার ফ্রান্সের মনোভাব পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কয়েকটা সামরিক ট্যাঙ্ক ঢুকিয়ে দিল রাইনল্যাণ্ডে এবং সঙ্গে কিছু সেনা। ফ্রান্স রুখে দাঁড়াল না, বরং তার সব সেনা সরিয়ে নিয়ে চলে গেল। এই রাইনল্যাণ্ডের সামরিক কারখানা গোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে সবচেয়ে বেশি ট্যাঙ্ক জোগান দিয়েছে। ফ্রান্স নিঃশব্দে রাইনল্যাণ্ডের সামরিক কর্তৃত্ব তুলে দিল জার্মানির হাতে। হিটলার সেখানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করল। কিছুদিনের মধ্যে হিটলার জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করলেন এবং তার পরের মাসেই দুনিয়া শুনলো, নাৎসি জার্মানি এক বিরাট বিমানবাহিনী গড়ে তুলেছে। বৃটেন ও ফ্রান্স তখন হিটলারের এই সামরিক আয়োজনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে চলল। বৃটেনের যে ধনিকরা যুদ্ধের অসম্ভব ক্ষতিপূরণ দাবি করে জার্মান গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ করে দিয়েছিল, তারাই এখন হিটলারকে সাহায্য করতে লাগল জার্মানিতে অর্থ লগ্নি করে এবং নগদ ঋণ জুগিয়ে। সোভিয়েট ইউনিয়ন স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা কীভাবে নতুন করে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। এরপর ১৯৩৬-এর নভেম্বরের শেষদিকে জার্মানি ও জাপান সোভিয়েট বিরোধী অভিযানের চুক্তিতে স্বাক্ষর করল। জার্মান ও ইটালির সেনাবাহিনী কমিউনিজমের কবল থেকে স্পেনবাসীকে মুক্ত করার ডাক দিয়ে স্পেন আক্রমণ করল; বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসকরা কেউ বাধা দিল না, মৌখিক একটা প্রতিবাদও করল না। সোভিয়েট বিরোধী চুক্তিতে ১৯৩৭ সালে ইটালিও যোগ দিল। জাপান ইতিমধ্যে চীন আক্রমণ করে পাইপিং, তিয়েনৎসিন এবং সাংহাই দখল করে নিয়েছে। পরের বছর ১৯৩৮-এর ১১ মার্চ অস্ট্রিয়া চলে গেল জার্মানির দখলে।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদীরা সরাসরি সংঘবদ্ধ হল

পৃথিবীর সামনে তখন দুটিমাত্র পথ খোলা। প্রথম পথ হল ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করা এবং এই সংঘশক্তির চাপে ফ্যাসিস্টদের অভিযান সময় থাকতেই প্রতিহত করা; আর দ্বিতীয় পথ হল, বিনা প্রতিরোধে ফ্যাসিস্টদের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাদের বিশ্বজয়ের পথ সুগম করে তোলা। হিটলার বিরোধী সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ চুক্তির জন্য সোভিয়েট বারবার আবেদন জানাতে লাগলো বৃটেন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়ার কাছে; জানালো — এই চুক্তি হলে চুক্তিভুক্ত যে কোন দেশ আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট লালফৌজ আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে ছুটে যাবে এবং সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিতভাবে ফ্যাসিস্ট বিরোধী অভিযানে সামিল হবে, তবে লালফৌজ যাবার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে অবশ্যই অনুমতি দিতে হবে। কিন্তু কেউই সোভিয়েটের আবেদনে সাড়া দিল না। বরং ফ্যাসিস্ট প্রচার সচিবরা, ফরাসী বৃটিশ মার্কিন দালালেরা মিলিত প্রতিরোধের নীতিকে কমিউনিস্ট নীতি বলে প্রচার করতে লাগল, দিবাস্বপ্ন বলে বিদ্রূপ করতে লাগল, প্রতিরোধ মানেই 'যুদ্ধের উস্কানি' বলে নিন্দা করতে লাগল। তার বদলে অনুমোদন করা হল আপস ও আত্মসমর্পণের নীতিকে, যে নীতির ফলে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। ১৯৩৮-এর ১১ জুন বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্সসভায় সরকারি দলের স্যার আর্নল্ড উইলসন বলেন ঃ 'আজকের পৃথিবীর বিপদ ফ্যাসিস্ট জার্মানি বা ইতালি নয়, বিপদ কমিউনিস্ট রাশিয়া।' ২৯-৩০ সেপ্টেম্বরে আপসনীতি চূড়ান্ত রূপ লাভ করল। নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স স্বাক্ষর করল মিউনিক চুক্তিতে। সোভিয়েট বিরোধী যে পবিত্র চুক্তির স্বপ্নে সারা দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীরা ১৯১৮ সাল থেকে বিভোর হয়েছিল তা বাস্তব রূপ নিল মিউনিকে। এই চুক্তির ফলে সোভিয়েট রাশিয়া একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেল। পূর্ব ইউরোপের পথ নাৎসি জার্মানির সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। ইংল্যাণ্ডে ফিরে হিটলারের সই করা চুক্তিপত্র দেখিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন বললেন, 'শান্তি হয়ে গেছে — এই হল শান্তির সনদ।' শুধু তাই নয়, চেম্বারলেন প্রস্তাব দিলেন —

সাতের পাতায় দেখুন

সারা বাংলা হকার্স কনভেনশন ও কর্মশালা

স্থায়ী ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবিতে গত ২ জুন সারা বাংলা হকার্স কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল মেদিনীপুর শহরে। বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে সহস্রাধিক হকারের প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ভানুরতন গুইন। সব বক্তারা বলেন, যে সরকার শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বেকারদের কাজ দিতে অপারগ তারাই বৃহৎ শিল্পপতিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপারেশন সানসাইনের নামে হকারদের উচ্ছেদ করছে। তাঁরা বিশ্বায়নের ঠিকাদার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অমানবিক আচরণের তীব্র নিন্দা করে দীর্ঘস্থায়ী জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হকারদের সর্বভারতীয় সংগঠন 'ন্যাসভি'র অন্যতম সদস্য গণেশ শঙ্কর সিং, প্রতাপ সাউ, হকার আন্দোলনের নেতা বিধান চ্যাটার্জী, অভ্যর্থনা কমিটির সহসভাপতি আশীষ কিশোর চ্যাটার্জী, পঞ্চানন প্রধান, প্রণব বসু, দীনেন রায়, ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা বিরতি দে, রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের নেতা অলক হুই, 'যাদের দেখেনা কেউ' ক্লাবের সম্পাদক শ্যামল দাস, অমল মাইতি, মেদিনীপুর জেলা হকার সংগ্রাম কমিটির সভাপতি গোপাল মজুমদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঐ দিন সারা বাংলা হকার্স কনভেনশনের প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যাসাগর হলে। ১১টি জেলা থেকে নির্বাচিত ১৫২ জন প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। সঞ্জিত বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ৫ জনের সভাপতিমণ্ডলী অধিবেশন পরিচালনা করেন। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক শঙ্কর দাস। মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন ১৭ জন প্রতিনিধি। স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবিতে ও পুলিশ-প্রশাসনের জুলুমের প্রতিবাদে জঙ্গি হকার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সঞ্জিত বিশ্বাসকে সভাপতি ও শঙ্কর দাসকে সম্পাদক করে ৪৭ জনের 'সারা বাংলা হকার্স ও ব্যবসায়ী সমিতি'র রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

পরদিন ৩ জুন সকাল থেকে হকারদের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় 'জাতীয় হকারনীতি' নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও প্রতিনিধিদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেন হকারদের সর্বভারতীয় সংগঠন 'ন্যাসভি'র অন্যতম নেতা গণেশশঙ্কর সিং, প্রতাপ সাউ, প্রবীণ আইনজীবী অশ্বিনী সেন, অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, ইউ টি ইউ সি-এল এসের জেলা সম্পাদক সিদ্ধার্থ মহাপাত্র প্রমুখ। কর্মশালা পরিচালনা করেন সারা বাংলা হকার্স ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। কর্মশালায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আশীষকিশোর চ্যাটার্জী, ভানুরতন গুইন, পঞ্চানন প্রধান, অমল মাইতি, শ্যামল দাস, সম্পাদক শঙ্কর দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কর্মশালা থেকে হকারদের ন্যায়সঙ্গত পুনর্বাসন ও জাতীয় হকারনীতি পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত কার্যকর করার লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে কুলতলী থানায় বিক্ষোভ

কুলতলী থানা এলাকায় সিপিএম দল পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে একের পর এক এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর জুলুম অত্যাচার, জমি দখল, পার্টি অফিস আক্রমণ ইত্যাদি ঘটিয়ে চলেছে। এগুলির মাধ্যমে তারা গোটা এলাকায় এক ভয়াবহ সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

গত ৩০ মে নলগোড়া এস ইউ সি আই পার্টি অফিস ভাঙচুর, লোকাল সেক্রেটারি কমরেডস্ শঙ্কর ভাণ্ডারী, বিপ্লব ভাণ্ডারী ও সুচিত্রা বৈদ্য'র উপর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে, ২০০২ সালের নলগোড়া অফিস আক্রমণ এবং কমরেড অশোক হালদার ও মোসলেম মিস্ত্রীর হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, ১৯৯৭ সালের ২৫ মার্চ পঞ্চশহীদ মার্ডার কেসের আসামীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা, মিথ্যা কেস প্রত্যাহার প্রভৃতির দাবিতে গত ৬ জুন এস ইউ সি আই কুলতলী ব্লক কমিটির উদ্যোগে তিন সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে কুলতলী থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পার্টির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার, কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে ১১ জনের এক প্রতিনিধি দল থানাতে যান। জনরোষের চাপে ক্যানিং সি আই এবং এস ডি পি ও উপস্থিত থেকে ডেপুটেশন গ্রহণ করেন।

ঐ সময় থানার বাইরে চলতে থাকা সভায় এসে আলোচনার ফলাফল জানান কমরডেস্ গোবিন্দ হালদার ও জয়কৃষ্ণ হালদার। তাঁরা জানান যে, এস ডি পি ও দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, দলের রং না দেখে সমস্ত আসামীদের তাঁরা অতিদ্রুত গ্রেপ্তার করবেন। সভায় বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও'র জেলা আহ্বায়ক কমরেড আনসার শেখ, ভুবনেশ্বরীর বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড প্রকাশ মাইতি, নলগোড়ার বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড গোবিন্দ আহেড়ী সহ কুলতলীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠকরা। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিধান চ্যাটার্জী পুলিশ প্রশাসন এবং সিপিএম-এর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুধু ডেপুটেশন নয়, এলাকার ফিরে গিয়ে গ্রামে গ্রামে গণকমিটি এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কলেজে সকল ছাত্রের ভর্তির সুযোগের দাবিতে বিক্ষোভ

এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিশেষ করে প্রথম বিভাগে ও স্টার পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ব্যাপক বাড়া সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা না বাড়ানোর ফরমান পাঠিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এহেন তুঘলকি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও-র কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসের সামনে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখায় এবং উপাচার্যকে স্মারকলিপি প্রদান করে আসনসংখ্যা বাড়িয়ে সমস্ত পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির দাবি জানানো হয়। পরে ছাত্রস্বার্থবিরোধী ফরমানের কপি পোড়ানো হয়।

ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা যুব শিবির

গত ৩-৫ জুন ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা যুব শিবির অনুষ্ঠিত হল। দুই শতাধিক যুবক-যুবতী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। লাঠিখেলা প্রদর্শনী, ফুটবল টুর্নামেন্ট, শরীর চর্চা, রক্তদান শিবির ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই শিবির প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

দীঘলগ্রাম নেতাজী বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে শিবিরের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধানবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল। সহস্রাধিক মানুষের এই সমাবেশে তিনি বলেন, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস যুব সমাজকে বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। পুঁজিবাদের সামগ্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি যুবসমাজকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বর্ষীয়ান নেতা কমরেড আতিয়ার রহমান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক কমরেড রঘুনাথ সেন, কমরেড পতিতপাবন মণ্ডল, ডি ওয়াই ও'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ।

৪ জুন রাজনৈতিক ক্লাস পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। ৫ জুন শিবিরের শেষ অধিবেশন পরিচালনা করেন কমরেড সদানন্দ বাগল। দেহ ও মন সহ সমস্ত দিক থেকে নিজেদের তৈরি করার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ ভলান্টিয়ার ইনচার্জ কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলী। রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন ৬৪ জন যুবক-যুবতী। এই শিবির থেকে কমরেড আব্দুল আলিমকে সভাপতি ও কমরেড পতিতপাবন মণ্ডলকে সম্পাদক করে ডি ওয়াই ও'র উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটি গঠিত হয়।

পেট্রল-ডিজেলের দাম পুনরায় বাড়ছে

চারের পাতার পর

তারই প্রতিযোগিতায় এরা লিপ্ত। ২। সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি বুর্জোয়া দল বা জোটের বদলে অপর একটি বুর্জোয়া দল বা জোটকে ক্ষমতায় আনলেও বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে জনগণের অবস্থা আরও খারাপ হবে এবং দুঃখ-দুর্দশা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। ৩। একমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে জনগণের স্বার্থের পরিপূরক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই জনগণ এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।

এমতাবস্থায় যতদিন তা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন এই বিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ে তোলার সাথে সাথে জনগণের স্বার্থে একমাত্র শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তুলে তার চাপে কিছুটা দাবি মানতে জনগণ সরকারকে বাধ্য করতে পারে। সেজন্য জনগণকে সংগঠিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পথে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণ অসংগঠিত বলেই শাসকদল বেপরোয়াভাবে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির বোঝা জনগণের উপর চাপাতে পারে। সংবাদে প্রকাশ, ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৪-এর ১ আগস্ট পর্যন্ত মোট ৭৬ বার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে (সূত্রঃ প্রতিদিন, ৭-৮-০৪)। এরপর ৪ নভেম্বর আবার একদফা মিলে মোট ৭৭ বার বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে বছরে তিন বারেরও বেশি। কেন্দ্র দাম বাড়ানোয় রাজ্য সরকারও কর বাবদ আয় বাড়িয়েছে, এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পেট্রল ও ডিজেলে লিটার প্রতি ১টাকা সেস আদায় করছে। জনগণ যদি সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়তে এগিয়ে আসেন তবে দাম বাড়ানোর আগে সরকারকে ভাবতে হবে, কিছুটা হলেও আন্দোলনের চাপে পিছু হঠতে হবে। যেমনটা হচ্ছে বিদ্যুৎ ও হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধির প্রশ্নে। এই দুটি ক্ষেত্রেও রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ যত তীব্র হতে পারে ততদূর পৌঁছতে না পারলেও যতটা সংগঠিত প্রতিবাদ হয়েছে, তার চাপেই সরকার যতটা বিদ্যুতের বিল, হাসপাতালের চার্জ বাড়াতে চেয়েছে ততটা পারেনি, চার্জ কমাতে হয়েছে। হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জ যত বাড়াতে সরকার চেয়েছে বহুক্ষেত্রে তার অর্ধেক বাড়াতে পেরেছে, ফ্রি-বেডও এখনও পুরোপুরি তুলে দিতে পারেনি। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায় করতে চেয়েও পারেনি। ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারে প্রস্তাবিত বর্ধিত চার্জ প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কমাতে বাধ্য হয়েছে সরকার। একমাত্র আন্দোলনের চাপেই দীর্ঘ উনিশ বছর লড়াই করে ইংরেজি শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে আনা গেছে।

দেশের মালিকশ্রেণী চূড়ান্ত সংগঠিত। তাদের রয়েছে চেম্বার্স অফ কমার্স জাতীয় নিজস্ব বিভিন্ন সংগঠন, রয়েছে তাদের টাকায় পুষ্ট, তাদের স্বার্থ দেখার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কংগ্রেস, বিজেপি'র মতো জাতীয় দল বা সি পি এম সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দল হচ্ছে এই ধরনের দল, যারা জনগণের বিরুদ্ধে মালিকশ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে চলেছে। মালিকরা এইসব দলের পিছনে দাঁড়াচ্ছে এবং তাদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু অসংগঠিত জনগণ অসহায়। যতদিন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দল, গণআন্দোলনের প্রকৃত শক্তিকে চিনে নিতে না পারবেন, ততদিন মানুষ মালিকশ্রেণীর আক্রমণের সামনে অসহায়ই থেকে যাবেন। যত দ্রুত মানুষ এই সত্য বুঝতে পারবেন এবং জনগণের নিজস্ব দল চিনে নিয়ে তার নেতৃত্বে সংগঠিত শক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন, তত দ্রুত শাসকদলগুলি মালিকশ্রেণীর স্বার্থে যেভাবে জনগণের উপর সমস্ত সঙ্কটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। এইটেই আজ জনগণের সামনে একমাত্র কর্তব্য।

সোভিয়েট জনগণের সংগ্রাম

পাঁচের পাতার পর

চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদাতেনল্যাণ্ড জার্মানির হাতে তুলে দিতে হবে।

মার্শাল ঝুকভ লিখছেন, 'আমরা (সোভিয়েট লালফৌজ) চেকোশ্লোভাকিয়াকে সামরিক সাহায্য দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের বিমান বাহিনী ও ট্যাঙ্কগুলিকে তৈরি রাখা হয়েছিল। পশ্চিম সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চলগুলোতে ৪০ ডিভিসন সৈন্য প্রস্তুত। কিন্তু তদানীন্তন চেক-শাসকরা এই সাহায্য নিতে অস্বীকার করল, বরং আত্মসমর্পণকেই শ্রেয় জ্ঞান করল, ১৫ মার্চ (১৯৩৯) জার্মানি প্রাগ (চেক রাজধানী) দখল করে নিল। হিটলার তোষণের এটাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি।'

এর ফলে ইউরোপের মধ্যে অস্ত্র নির্মাণের বৃহত্তম কারখানা স্কোডা চলে গেল হিটলারের দখলে। নাৎসিরা যখন চেক-ভূমি দখল করে বসল তখন জানা গেল, বৃটেনের ধনিকরা নবঅধিকৃত শিল্পগুলোতে টাকা খাটানোর জন্য তার কয়েক সপ্তাহ আগেই জার্মানির সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছিল। ২০ মার্চ লিথুয়ানিয়া তার একমাত্র বন্দর মেমেল জার্মানিকে উপহার দিয়ে দিল। ৭ এপ্রিল ইতালি আক্রমণ হানল আলবেনিয়ায় এবং ৫ দিনের মধ্যেই দখল করল।

হিটলার বাহিনী যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার বুক চিরে এগিয়ে চলেছে তখন জার্মানি-প্রতিরোধের পরিকল্পনা করতে সোভিয়েট ইউনিয়ন বৃটেনের কাছে প্রস্তাব রাখল যে, বৃটেন ফ্রান্স পোল্যাণ্ড রোমানিয়া তুরস্ক ও রাশিয়ার অবিলম্বে এ ব্যাপারে একটা আলোচনা সভায় মিলিত হওয়া দরকার। বৃটেন পত্রপাঠ এ প্রস্তাব নাকচ করে দিল; বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জানালেন — না, এখনো তেমন আলোচনার সময় হয়নি।

বৃটেন-আমেরিকা-ফ্রান্সের 'হস্তক্ষেপ না করার নীতি' আসলে কী

১৯৩৯-এর ১০ মার্চ সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসের অধিবেশনের ভাষণে কমরেড স্ট্যালিন বললেন, ''আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলো অনাগ্রাসী রাষ্ট্রগুলোর, বিশেষ করে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সীমানা সর্বদিক থেকে লঙঘন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আর অনাগ্রাসী রাষ্ট্রগুলো ক্রমাগত পিছু হটে আসছে এবং একের পর এক সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলিকে।..... অবিশ্বাস্য হলেও এটাই বাস্তব।'' তিনি বললেন, ''অনাগ্রাসী দেশগুলো নিজেদের বিরাট সুবিধাজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও আক্রমণকারীদের তুষ্ট করতে নিজেদের অবস্থান থেকে ও নিজেদের উচিত কর্তব্য থেকে অতি সহজেই পিছু হটে আসছে এবং কোনরকম প্রতিরোধ ছাড়াই।.... এটা কি অনাগ্রাসী রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতার প্রতিফলন? মোটেই নয়। অনাগ্রাসী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত ক্ষমতা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির থেকে প্রশ্নাতীতভাবেই বেশি, অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক থেকেই। তাহলে এরা আগ্রাসীদের ক্রমাগত সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে কেন? ... প্রধান কারণ, অনাগ্রাসী দেশগুলোর বেশিরভাগ, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যৌথ নিরাপত্তার নীতি, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধের নীতি পরিত্যাগ করেছে এবং হস্তক্ষেপ না করার নীতি অর্থাৎ 'নিরপেক্ষ' অবস্থান গ্রহণ করেছে।

হস্তক্ষেপ না করার নীতি বলতে কী বোঝায়? স্ট্যালিন বললেন, ''কেতাবী অর্থ আগ্রাসীদের আক্রমণ থেকে প্রতিটি দেশ যেভাবে খুশি নিজেদের রক্ষা করুক, নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করুক। এটা আমাদের ভাববার বিষয় নয়। (আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত — উভয় রাষ্ট্রের সঙ্গেই আমরা ব্যবসা করব।' কিন্তু বাস্তবে এই নীতির অর্থ হচ্ছে, আগ্রাসনের ষড়যন্ত্রে হাত মেলানো, যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা, এবং ফলস্বরূপ যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে দেওয়া। হস্তক্ষেপ না করার নীতির দ্বারা তারা চাইছে ..... সকল যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র যুদ্ধের গভীর আবর্তে ডুবে যাক এবং সেজন্য তারা চাইছে তলে তলে যুদ্ধকে উৎসাহিত করতে; তারা চাইছে — যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ করে করে নিজেরা দুর্বল হোক, ধ্বংস হোক এবং তারপর যখন ওরা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়বে তখন তারা পূর্ণশক্তি নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হবে, আবির্ভূত হবে অবশ্যই 'শান্তির স্বার্থে', এবং যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়া রাষ্ট্রগুলির উপর শর্ত চাপাবে। কী সস্তা ও সহজ!'' তিনি আরও বললেন, ''কোন কোন ইউরোপীয় ও মার্কিন রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক সোভিয়েট-ইউক্রেনের উপর আক্রমণের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে গুণতে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তাঁদের হস্তক্ষেপ না করার নীতির পিছনে কী মতলব আছে তা তাঁরা নিজেরাই বলতে শুরু করেছেন। খোলাখুলিভাবে সংবাদপত্রে তাঁরা লিখছেন যে, জার্মানরা তাদের ভীষণ 'নিরাশ' করেছে, কারণ, আরও পূর্বদিকে অভিযান চালানো ও সোভিয়েটের উপর আক্রমণ করার বদলে তারা পশ্চিমদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এখন উপনিবেশ দাবি করছে। .... সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর আক্রমণ হানবে — এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জার্মানির হাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার কয়েকটা জেলা তুলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু জার্মানি এখন তার প্রতিদান দিতে অস্বীকার করছে, এবং তাদেরই জাহান্নামের রাস্তা দেখাচ্ছে।'' এমনিভাবে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আসল মতলব উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছিলেন স্ট্যালিন।

বৃটেনের শঠতাপূর্ণ কালক্ষেপ

এতদ্‌সত্ত্বেও সোভিয়েট সরকার আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্মিলিত প্রতিরোধ ও নিরাপত্তার বাস্তব নীতি কার্যকর করবার জন্য বৃটেনের কাছে মৈত্রী প্রস্তাব পাঠায়। বৃটেন সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। তখন বৃটেনবাসীই প্রশ্ন তোলেন, প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন নিজে হিটলারের সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নিজে জার্মানিতেও গেলেন; রোমে গিয়ে তিনি মুসোলিনির সঙ্গে এক টেবিলে খানা খেয়ে তাঁর কত গুণগানই না করলেন! অথচ সোভিয়েটের ক্ষেত্রে উল্টোনীতি কেন? চেম্বারলেন তখন বাধ্য হয়ে ২৫ মে মস্কোস্থ বৃটিশ ও ফরাসী দূতকে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার নির্দেশ দিলেন। ইতিমধ্যেই জার্মানদের চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পর অতি মূল্যবান দশটি সপ্তাহ নষ্ট করা হয়েছিল। আরও তিন সপ্তাহ নষ্ট করা হল একজন মিঃ স্ট্যাং-এর মস্কো পৌঁছানোর প্রতীক্ষা করে। কে এই স্ট্যাং? ইনি বৃটেনের মন্ত্রীমণ্ডলীর নগণ্যতম ব্যক্তিও নন, বৈদেশিক দপ্তরের একজন কেরানী। তিনি মস্কো পৌঁছলে দেখা গেল যে, কোন কিছুতে স্বাক্ষর দেবার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়নি। তবু কথাবার্তা চলল ৭৫ দিন ধরে, তার মধ্যে বৃটিশ পক্ষ ৫৯ দিন লাগিয়ে দিল শুধু প্রস্তাবটা লিখতে। বেশ বোঝা গেল, বৃটেন অযথা কালক্ষেপ করতে চাইছে। আলোচনা চালকালীনই হঠাৎ ফাঁস হয়ে গেল, বৃটেনের বহির্বাণিজ্য দপ্তরের পরিষদ সম্পাদক জার্মানির সঙ্গে কয়েক হাজার কোটি পাউণ্ড ঋণদান সম্পর্কে গোপনে কথাবার্তা চালাচ্ছে। ক্রমশ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সোভিয়েটকে একাই ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে, এবং সেই ফ্যাসিস্ট জার্মানির পেছনে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে সমর্থন জানাবে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কিন প্রতিনিধি ই ডেভিস প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পরামর্শদাতা হ্যারি হপকিন্সকে একটা চিঠিতে (১৮ জুলাই, ১৯৪১) লিখেছিলেন, ''...মিউনিক চুক্তি সই হওয়ার পরও, এমনকী ১৯৩৯ সালের বসন্তকালেও জার্মানি যখন পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া আক্রমণ করল তখনও সোভিয়েট ইউনিয়ন বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে লড়তে রাজি ছিল। তার আগে সোভিয়েট শুধু দাবি করেছিল যে, অনাগ্রাসী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটা অধিবেশন বসুক এবং তাতে আগে পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়ে যাক — প্রত্যেকের কর্তব্য কী হবে। তারপর সেই মিলিত প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত হিটলারের উপর জারি করা হোক।..... চেম্বারলেন (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন.....। সোভিয়েটের তখন স্থির ধারণা হল, অবশ্য সে ধারণা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে বাস্তবিক কাজে লাগার মত কোন বোঝাপড়াই সম্ভব হবে না।''

[ক্রমশঃ]

ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে এ আই ডি এস ও'র যুক্ত আন্দোলন

পাঞ্জাবে কংগ্রেস সরকার দু'হাজার সরকারি স্কুলকে বেসরকারীকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া আই টি আইগুলিতে ব্যাপক হারে ফি বৃদ্ধি করেছে। আই টি আইগুলিতে চলতি ফি ছিল ৩,৪৫০ টাকা, যা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বহন করাই ছিল দুঃসাধ্য। এই ফি বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হয়েছে। এর ফলে বহু ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। এরই বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও সহ অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির যুক্ত মোর্চা জে এস এফ (জয়েন্ট স্টুডেন্টস ফ্রন্ট) আন্দোলন গড়ে তুলেছে। গত ১১ এবং ১২ মে মোহালি, রোপার, বাদলাধা, রাজপুরা, পাতিয়ালা, বানুর, সুনম প্রভৃতি আই টি আইগুলিতে সর্বাত্মক ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। ২৬ মে বালুর, রাজপুরা ও মোহালিতে ডি সি অফিস অভিযান করে ফি বৃদ্ধি বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। ৩০ ও ৩১ মে মোহালি সরকারি আই টি আই, ফেজ ৫-এ সর্বাত্মক ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। এই কর্মসূচিগুলিতে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন ডি এস ও পাঞ্জাব রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেডস্ ইন্দর সিংহ, কিরাত গ্রেওয়াল, মনজিৎ কোত্রা, মনু কৌশল, হরদয়াল এবং ধর্মেন্দর বিট্টু।

কেরালা

রাজ্যব্যাপী গণসংগ্রামে এস ইউ সি আই

কেরালায় শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের চিহ্নিত দল কংগ্রেস এবং বিজেপি-ই নয়, বামপন্থার আলখাল্লাধারী সিপিএম, সিপিআই-ও যখন শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের কর্মসূচির পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তখন রাজ্যের ১৪টি জেলাতেই গণসংগ্রামের ঝাণ্ডা তুলে ধরল এস ইউ সি আই। পেটেন্ট আইন এবং সিড বিল বাতিল, ভ্যাট প্রত্যাহার, সর্বশিক্ষা অভিযান বন্ধ করা, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল করা, বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত কেরালা সরকার পরিচালিত মডার্নাইজিং গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম (MGP) বাতিল করা, আলেপ্পি উপকূল থেকে বালি তোলার সিদ্ধান্ত বাতিল করা, দেশ থেকে পেপসি ও কোকাকোলা কোম্পানি বিতাড়নের দাবিতে এবং সুনামি ত্রাণ তহবিলের টাকা অন্যখাতে খরচ করার প্রতিবাদে ও দুর্গতদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে গত ২৩ মে এস ইউ সি আই কেরালা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে ধরনা ও রাজভবন অভিযান সংগঠিত করা হয়।

তার আগে সারা রাজ্যে সপ্তাহকালব্যাপী ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শত শত পথসভা, অনেকগুলি জনসভা, জীপ-প্রচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জনজীবনে নেমে আসা আক্রমণগুলির ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়। এই উপলক্ষে দলের মুখপত্র 'ইউনিটি'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এদিনের রাজভবন অভিযানে শিল্প-শ্রমিক, কৃষি-শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক, অস্থায়ী শ্রমিক ও পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমিক সহ ছাত্র, যুবক, মহিলারা ব্যাপক সংখ্যায় সামিল হয়েছিলেন।

সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে বক্তব্য রাখছেন কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস

ধরনার উদ্বোধনী ভাষণে দলের কেরালা রাজ্য সম্পাদক সি কে লুকোস বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অনুসৃত বিশ্বায়নের আক্রমণের মোকাবিলায় শ্রমজীবী জনগণের সামনে আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। ধরনায় বক্তব্য রাখেন কেরালার খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ডঃ এন এ করীম, প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড কে পি কোসালা রামাদাস, সিপিআই (এম-এল)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে শিবরামন, ত্রিবান্দ্রম জেলা বিটিআর-ইএমএস-একেজি জনকিয়া বেদীর আহ্বায়ক কমরেড শ্রীনিবাস দাস এবং লেখক ও সাংবাদিক ডঃ নান্দিয়োদের রামচন্দ্রন। সভাপতিত্ব করেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ভি ভেনুগোপাল।

এরপর মিছিল রওনা দেয় রাজভবনের দিকে। মিউজিয়ামের কাছে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করলে সেখানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড ভেনুগোপাল, ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর রাজ্য সভাপতি কমরেড জালালুদ্দিন, ডঃ ডি সুরেন্দ্রনাথ, এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড শাইলা কে জন, দলের রাজ্য কমিটির সদস্য বি কে রাজাগোপাল প্রমুখ। বক্তারা আন্দোলনকে বৃহত্তর পর্যায়ে উন্নীত করার আহ্বান জানান।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

শিলিগুড়িতে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল

'ওরা সভ্যতার লজ্জা! ওরা বাংলার ছাত্রসমাজের কলঙ্ক! ওরা ছাত্রদের পিটিয়ে মারে! ওরা এস এফ আই। ওরা খুনি! খুনিদের ক্ষমা নয়' — ৬ জুন শিলিগুড়িতে দুই সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর ধিক্কার মিছিল থেকে ধ্বনিত হয়েছিল এই কথাগুলিই। এই মিছিলের ডাক দিয়েছিল ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও। গত ২৫ মে শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র সনু কুমার প্যাটেলকে স্কুল চত্বরেই পিটিয়ে হত্যা করে এস এফ আই দুর্বৃত্তরা। এ মিছিল তাই ধিক্কার জানিয়েছে এস এফ আইকে, এস এফ আই সংস্কৃতিকে।

এই মিছিলে শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুল সহ বহু স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সামিল হয়েছিল। জলপাইমোড় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শিলিগুড়ি কোর্ট চত্বরে মিছিল পৌঁছায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্রসমাজের অগ্রগামী প্রতিনিধিরা এসেছিল এই নৃশংসতার প্রতিবাদ জানাতে। সাম্প্রতিককালে শিলিগুড়ি শহরে এত বিশাল মিছিল আর হয়নি। মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর চোখমুখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছিল প্রবল ঘৃণা। ছাত্র হারানোর শোককে বুকে নিয়ে সুশৃঙ্খল এই মিছিল দেখে পথচলতি মানুষও থমকে দাঁড়িয়েছেন, শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের এই সীমাহীন বর্বরতায় তাঁরাও স্তম্ভিত।

এদিনের প্রতিবাদী ছাত্রমিছিলে নেতৃত্ব দেন এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজিত ঘোষ, দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষে কমরেডস্ সঞ্জয় বিশ্বাস, শোভা কার্জি, জয় লোধ, জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড বিনয় বন্ধু মজুমদার, কোচবিহার জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড মৃণাল রায়, উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড দুলাল রাজবংশী, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড দীনেশ মহন্ত।

রিগিং প্রতিরোধে নাগরিক কমিটি

ভাটপাড়া পুরসভায় জিতেও সিপিএম ২৫নং ওয়ার্ডে বিজয় মিছিল বাতিল করে দিল। ঐ ওয়ার্ডে বৃহত্তর শ্যামনগর নাগরিক কমিটি সিপিএম-এর ব্যাপক ছাপ্পা ভোটের বিরুদ্ধে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং নির্বাচনের পরেও রিগিং বিরোধী জনমত গড়ে তুলেছিল, তাতে সিপিএম বিজয় মিছিলের কর্মসূচি বাতিল করতে বাধ্য হয়। এই ওয়ার্ডে নাগরিক কমিটির প্রার্থী ছিলেন কল্পনা বাগল। ভোটের দিন অন্যান্য ওয়ার্ডে যা হয়েছে, এই ওয়ার্ডেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে বার করে দেওয়া হয়, বার করে দেওয়া হয় অন্যান্য দলের প্রার্থীদেরও। নাগরিক কমিটির প্রার্থী কল্পনা বাগল ও এজেন্ট চঞ্চল ঘোষকে দফায় দফায় মারা হয়। তাঁরা দৃঢ়তার সাথে রুখে দাঁড়ালে পুলিশের সামনেই আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাঁদের বের করে দিয়ে দুর্বৃত্তরা নির্বিঘ্নে চালাতে থাকে ব্যাপক ছাপ্পা। পুলিশ নির্বিকার। এই অবস্থায় নাগরিক কমিটির প্রার্থীরা এই ভোট-প্রহসনের প্রতিবাদে এজেন্টদের প্রত্যাহার করে নেন এবং ২৪ মে জনগণের কাছে লিফলেট বিলি করে প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই প্রতিবাদপত্র জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ২৮ মে এক কনভেনশনে এলাকার নাগরিকেরা সমবেত হয়ে ছাপ্পা ভোট ও রিগিং-এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানান এবং রিগিং প্রতিরোধে নাগরিক কমিটিকে আরও শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বৃহত্তর শ্যামনগর নাগরিক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়; বক্তব্য রাখেন হরি ব্যানার্জী, রবীন গুহ, কল্পনা বাগল, রমেন রায়, অমল চক্রবর্তী প্রমুখ। এই সভা এলাকার মানুষের মধ্যে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, সিপিএমের বহু মানুষ যারা ছাপ্পা-ঝড়ে ভোট দিতে পারেননি তাঁরাও নির্বাচিত কমিশনারকে 'ছাপ্পা কমিশনার' বলে অভিহিত করেন। নাগরিক কমিটি এক প্রচারপত্রে বলেছে, "নির্বাচনকে যেভাবে প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সমবেত হোন — রুখে দাঁড়ান। সমাজকে কলুষমুক্ত করতে এগিয়ে আসুন। ক্ষমতা-লোভী গণতন্ত্রহন্তাদের সমস্ত কাজে সামাজিক বয়কট করুন।" এই অবস্থায় সিপিএমের সামনে বিজয় মিছিল বাতিল করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না।

রাস্তা সারানোর দাবিতে গণঅবস্থান

ভগবানগোলার স্বপনগড় থেকে পি ডব্লু ডি আই মোড় পর্যন্ত ভাঙাচোরা রাস্তা মেরামত করা ও দয়ানগর থেকে বর্ষাতিগোলা মোড় পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণের দাবিতে 'ভগবানগোলা রাস্তা বাঁচাও কমিটি' গত ২৪ মে বিডিও অফিসে অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির (পূর্ব জোন) সদস্যরা এই অবস্থানে অংশ নেন। ইউনুস মোল্লা, লক্ষ্মণ দাস সহ ১০ জনের এক প্রতিনিধি দল বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দেন।

পরদিন বিডিও দু'জন ইঞ্জিনিয়ার ও রাস্তা বাঁচাও কমিটির নেতাদের নিয়ে রাস্তাটি পরিদর্শন করেন ও দ্রুত সংস্কারের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানান।

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ

নিরপরাধ শিক্ষিত বেকার যুবকরা স্বনিযুক্তি প্রকল্পের শিকার হয়ে আজ ঋণগ্রস্ত, অপরাধী। তাদের আসামীর কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে, আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে বেশ কিছু হতভাগ্য বেকার যুবককে। ঋণের টাকার ২৫ শতাংশ অনুদানের বিনিময়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড কেড়ে নিয়ে সরকারি চাকরি থেকে চিরতরে বঞ্চিত করে এবং আর্থিক সাহায্যকে সুকৌশলে ব্যাঙ্ক ঋণে রূপান্তরিত করে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদসহ বিশাল ঋণের বোঝা বেকারদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই ঋণ আদায়ের নামে চলছে নানা ধরনের কালাকানুন প্রয়োগ, প্রশাসনিক অত্যাচার, পুলিশি জুলুম। অথচ বড় বড় শিল্পপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ মকুব ও কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এরই প্রতিকারের দাবিতে ৮ জুন সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সহস্রাধিক বেকার যুবক-যুবতী কলকাতার রানি রাসমণি রোডে সমবেত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত ৯ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের কাছে জমা দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি প্রবীর মাহাতো এবং সম্পাদক নন্দদুলাল দাস। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা জগন্নাথ রায়মণ্ডল, আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in